তাকবিয়াতুল ঈমান

তাওহীদের পয়গাম

মূল

ইমাম শাহ ইসমাঈল শহীদ

রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ভূমিকা ও টীকা

মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

রহমাতুল্লাহি আলাইহি

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর নামে শুরু
যিনি সকলের প্রতি দয়াবান,
পরম দয়ালু।

تقوية الايمان

তাকবিয়াতুল ঈমান

তাওহীদের পয়গাম

মূল

ইমাম শাহ ইসমাঈল শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

জন্ম : ১১৯৩ – মৃত্যু : ১২৪৬ হিজরী

ভূমিকা ও টীকা সংযোজন

মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

রহমাতুল্লাহি আলাইহি

জন্ম : ১৩৩২ – মৃত্যু : ১৪২০ হিজরী

অনুবাদ ও তাখরীজ

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্বাস হানীফ

উস্তায : জামিয়াতুল আযীয আলইসলামিয়া, ঢাকা উদ্যান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

উলূমুল হাদীস : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

সম্পাদনা

সম্পাদনা পরিষদ : মাকতাবাতুল আশরাফ

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

তাকবিয়াতুল ঈমান – তাওহীদের পয়গাম

মূল : ইমাম শাহ ইসমাঈল শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি
ভূমিকা ও টীকা সংযোজন : সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
অনুবাদ ও তাখরীজ : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্বাস হানীফ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
জুমাদাল উলা ১৪৪২ হিজরী
ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-91729-7-0

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, facebook.com/EhsanBookshop, khidmashop.com
☎16297 or 01519521971 ☎ 01832093039 ☎ 01939773354

মূল্য : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

TAQWIATUL EMAN - TAUHIDER POYGAM
By : Imam Shah Ismail Shahid Rh.
Translated by : Maulana Muhammad Abbas Hanif
Price: Tk. 320.00 US$ 6.00

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اَمَّا بَعْدُ.

ঈমানের সর্বপ্রথম রোকন হলো নির্ভেজাল তাওহীদ। তাওহীদের মূল কথা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই রব ও মাবূদ বলে মানা, রব ও ইলাহ হওয়ার বিষয়ে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। একমাত্র তাঁকেই আলিমুল গাইব, হাজির-নাজির, মুখতারে কুল (সর্ব বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী), মুশকিল-কুশা (সংকট নিরসনকারী) এবং বিপদাপদে ত্রাণকর্তা বিশ্বাস করবে। তাঁর একান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহে কাউকে শরীক মনে করবে না। সাধারণ উপায়-উপকরণের ঊর্ধ্বের বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। উপকার-অপকার, লাভ-লোকসান, সুস্থতা-অসুস্থতা, আপদ-নিরাপত্তা, জীবন-মৃত্যু একমাত্র তাঁরই হাতে বিশ্বাস করবে। তিনিই তা দান করেন। রিযিকদাতা একমাত্র তিনি। গোটা জগতের এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রকও তিনিই। এতে কাউকে শরীক করবে না। মোটকথা, তাওহীদকে পূর্ণরূপে ধারণ করা ও শিরক থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন। এমন শিরকমুক্ত ঈমানের সাথেই কেবল নাজাতের ওয়াদা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٢﴾

‘যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুম অর্থাৎ শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি তো কেবল তাদেরই অধিকার এবং তারাই সঠিক পথে পৌঁছে গেছে।’ —সূরা আনআম, আয়াত ৮২

পক্ষান্তরে যারা ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝١٠٦ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ
مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٠٧

‘তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে। তবে কি তারা এ বিষয়ের একটুও ভয় রাখে না যে, তাদের উপর আল্লাহর আযাবের কোনও মুসিবত এসে পড়বে অথবা সহসা তাদের উপর তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামত আপতিত হবে?’ – সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৬-১০৭

স্মরণ রাখা দরকার যে, সকল নবী-রসূলের প্রধান মিশন ছিল এই শিরক নির্মূল করে খাঁটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আখেরী পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই মিশন নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। নবীর পরে তাঁর ওয়ারিশ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনসহ প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের উলামায়ে কেরাম এই মিশন বাস্তবায়ন করেছেন। তারা খাঁটি তাওহীদের প্রচার-প্রসার করেছেন এবং যাবতীয় শিরকের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন। তাদের ওয়াজ ও খুতবা এবং রচনা ও গ্রন্থনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকত এই তাওহীদ ও শিরকের বয়ান। সেই ধারাবাহিকতার একটি বিখ্যাত ও কালজয়ী গ্রন্থ হলো হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর **‘তাকবিয়াতুল ঈমান’**।

আল্লাহ তাআলা লেখকের ইখলাস ও দরদের বদৌলতে গ্রন্থটিকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, গত দু’শ বছর যাবৎ এটি অসংখ্য-অগণিত পথভোলা মানুষের হেদায়াতের মাধ্যম হয়ে আসছে। মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. লিখেছেন– ‘আল্লাহ তাআলা ভারত উপমহাদেশের কত লোককে-যে এর মাধ্যমে উপকৃত করেছেন তার কোনও ইয়ত্তা নেই। নিঃসন্দেহে তাদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন হবে।’

আমাদের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ শুরু থেকেই এই কিতাবটির সমর্থন করে আসছেন এবং এর বিরুদ্ধে বিদআতপন্থীদের যাবতীয় আপত্তি খণ্ডন করেছেন।

একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়–

> তাকবিয়াতুল ঈমানে কি এমন কোনও মাসআলা আছে, যেটা আমলযোগ্য নয়, নাকি এর সকল মাসআলাই সহীহ এবং উলামাদের নিকট গ্রহণযোগ্য? আর একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মৌলভী ইসমাঈল শহীদ তার ইন্তেকালের সময় অনেক মানুষের উপস্থিতিতে তাকবিয়াতুল ঈমানের কিছু মাসআলা থেকে তাওবা করেন, আপনিও কি এ কথা শুনেছেন, নাকি এটা মিথ্যা রটনা? কোনও ব্যক্তি যদি মাওলানা মরহুম (ইসমাঈল)-কে শ্রদ্ধা না করে এবং তাকে সহীহ আকীদাওয়ালা ও বুযুর্গ মনে না করে তাহলে কি সে বিদআতী ও ফাসেক, নাকি না?

উত্তরে হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন :

> অধমের নিকট এর সকল মাসআলাই সহীহ, যদিও কিছু মাসআলায় বাহ্যত কঠোরতা রয়েছে। আর কিছু মাসআলা থেকে তার তাওবা করার ঘটনা বিদআতপন্থীদের মিথ্যা রটনা। কেউ যদি মিথ্যা রটনা শুনে তাকে বুযুর্গ মনে না করে, তাহলে সে মাযুর। আর যদি কিতাবের বিপরীত আকীদা পোষণ করে তাহলে সে বিদআতী ফাসেক।
>
> (দেখুন– তালিফাতে রশীদিয়া, পৃ. ৮৯-৯০)

কিতাব সম্পর্কে আমরা আর কথা দীর্ঘ করব না। কিতাবের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পাঠক মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর ভূমিকা থেকে সম্যক অবগতি লাভ করতে পারবেন।

আমাদের এই সংস্করণের বড় বৈশিষ্ট্য হলো, কিতাবটির আরবী সংস্করণে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. যে শিরোনাম ও মূল্যবান টীকা যুক্ত করেছেন, এখানে সেগুলোরও অনুবাদ যোগ করা হয়েছে। সাথে অনুবাদক কর্তৃক কিতাবে উল্লিখিত সকল হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাখরীজ যুক্ত করা হয়েছে। এসবকিছু মিলে কিতাবটি ‘নূরুন্ আলা নূর’-এর উত্তম নমুনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা এর মহান লেখক, টীকাকার ও অনুবাদককে আপন শান মোতাবেক জাযায়ে খায়র দান করুন। এর উসিলায় সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের ব্যবস্থা করুন। আমীন।

আমরা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী এ মূল্যবান গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারও দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদের অবগত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

তারিখ
১৭ রবীউস সানী ১৪৪২ হিজরী
০৩ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দারুত তাসনীফ-মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ৪র্থ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ
النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ!

বান্দার উপর সর্বপ্রথম ফরয হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। আর ঈমানের প্রথম কথাই হলো খাঁটি তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং সব ধরনের শিরক পরিহার করা। ছোট-বড় যে কোনও প্রকারের শিরক ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই ঈমানকে পূর্ণ করার জন্য তাওহীদ ও শিরকের পরিচয় জানা এবং তাওহীদকে আঁকড়ে ধরে শিরক পরিহার করার কোনও বিকল্প নেই।

কুরআন-হাদীসে তাওহীদের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং শিরকের নিন্দা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এসেছে। যুগে যুগে অনেক মনীষী এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। সেই ধারাবাহিকতার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো মুজাহিদে আযম শহীদে মিল্লাত ইমাম শাহ ইসমাঈল দেহলভীর **'তাকবিয়াতুল ঈমান'**।

লেখক হিন্দুস্তানী সমাজে বেড়ে ওঠার দরুন এখানের প্রচলিত শিরক-বিদআত কাছ থেকে দেখেছেন। দেখেছেন হিন্দুদের সাথে দীর্ঘকালীন সহাবস্থানের কারণে মুসলিম সমাজে কত বিচিত্র রকমের শিরক-বিদআত শেকড় গেড়ে আছে। তিনি এই গ্রন্থে সেসবের প্রত্যক্ষ বিবরণ পেশ করেছেন এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে সেগুলোর ভয়াবহতা ও খণ্ডন তুলে ধরেছেন।

কিতাব সম্পর্কে আমি কথা লম্বা করব না। সামনে উল্লিখিত মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. লিখিত ভূমিকা পড়লেই পাঠক কিতাবটির গুরুত্ব ও মূল্য অনুধাবন করতে পারবেন, যা তিনি কিতাবটির আরবী অনুবাদের প্রাককথন হিসেবে লিখেছেন।

অনুবাদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত উর্দূ 'তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থের অনুবাদ। তবে শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.-এর নির্দেশে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. **'রিসালাতুত তাওহীদ'** নামে কিতাবটির যে আরবী অনুবাদ করেছেন, তাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় যোগ করেছেন। ভূমিকা, লেখকের জীবনী, পার্শ্বশিরোনাম এবং মূল্যবান পাদটীকা। আমাদের বাংলা সংস্করণে এই বিষয়গুলো আরবী থেকে অনুবাদ করে যোগ করে দিয়েছি। এতে কিতাবটি থেকে উপকৃত হওয়া আরও গভীর, ব্যাপক ও সহজতর হবে বলে আশা করি।

গ্রন্থটির অনুবাদ উর্দূ তাকবিয়াতুল ঈমান সামনে রেখে করা হলেও কোথাও কোথাও মর্মোদ্ধার বা সহজিকরণের জন্য হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. অনূদিত কিতাবটির আরবী সংস্করণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অতএব অনুবাদকে মূলের সাথে মিলিয়ে দেখতে চাইলে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

গ্রন্থে উল্লিখিত আয়াতসমূহের বাংলা তরজমা তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (মাকতাবাতুল আশরাফ) অবলম্বনে করা হয়েছে।

গ্রন্থে প্রদত্ত সকল হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাখরীজ[১] টীকায় যুক্ত করা হয়েছে। লেখক রহ. হাদীসগুলো মিশকাত শরীফের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাখরীজ করার ক্ষেত্রে আমরা মিশকাতের উৎস-গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সেক্ষেত্রে কিতাবে উল্লিখিত শব্দের সাথে কোথাও উৎস-গ্রন্থের শব্দের কিছু অমিল থাকলে আমরা উৎস-গ্রন্থের শব্দমালা উল্লেখ করেছি। ফলে অনুবাদও সে হিসেবেই করা হয়েছে।

আর কয়েকটি হাদীস রযীন রহ.-এর সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তালিবে ইলমগণ জানেন যে, রযীন রহ.-এর কিতাবটি মিশকাত শরীফ বা জামিউল উসূলের মতো হাদীসের একটি সংকলনমাত্র। এই কিতাবে তিনি সনদ উল্লেখ করেননি। তাই আমরা তাখরীজের সময় ওই কয়টি

---

[১] হাদীসের তাখরীজ মানে, হাদীসের উৎস-গ্রন্থ থেকে হাদীসটি বের করে সহীহ-যয়ীফ ইত্যাদি মান নির্ণয় করা।

হাদীস অন্যান্য উৎস-গ্রন্থে যে শব্দে পেয়েছি সেভাবে উল্লেখ করে অনুবাদ করেছি।

অনুবাদকে সহজ ও সাবলীল করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। একদিকে কিতাবটির উর্দূ অনেকটা প্রাচীন ধাঁচের, অপরদিকে এটিই আমার প্রথম অনুবাদ, সাথে রয়েছে নিজের দুর্বলতা, সবকিছু মিলিয়ে কতটুকু সফল হয়েছি তা বিজ্ঞ পাঠকই নির্ধারণ করবেন।

দৃষ্টি-আকর্ষণ

পাঠকদেরকে একটি বিষয়ে সতর্ক করতে চাই। তা হলো, এই গ্রন্থে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শিরক চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো পড়ার পর একজন পাঠকের কর্তব্য হলো, নিজে ওই সকল শিরকি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা এবং পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও পরিচিতজনসহ অন্যান্যদের সতর্ক করা। কিন্তু কারও মাঝে এসব শিরকি কর্মকাণ্ড দেখলে তাকে কাফের বা মুশরিক ফাতওয়া দিতে যাবেন না। কারণ কোনও মুসলমানকে কাফের ফাতওয়া দেওয়া যার-তার কাজ নয়। বরং বিজ্ঞ মুফতীরাই তা নির্ধারণ করবেন।

এ বিষয়ে স্বয়ং লেখক শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. তার একটি ফাতওয়াতে সতর্ক করেছেন এবং তাকবিয়াতুল ঈমানের আলোচ্যবিষয় সম্পর্কে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। সমঝদার পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে সেই ফার্সী ফাতওয়াটির অনুবাদ তুলে ধরছি। মূল ফাতওয়ার জন্য দ্রষ্টব্য তালিফাতে রশীদিয়া[২]

> **প্রশ্ন :** তাকবিয়াতুল ঈমানে উল্লিখিত কিছু শিরকি কাজ, যেমন– গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করা, কবর চুম্বন করা, তাতে গেলাফ পরানো, গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়া ইত্যাদি কাজ যদি যায়েদ (কল্পিত নাম) দ্বারা সংগঠিত হয়, তাহলে যায়েদকে কাফের বলা, তার জান-মাল

---

২. (হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ-এর রচনা ও ফাতওয়া সমগ্র), পৃ. ৮৬-৮৭। এখানে হযরত গঙ্গুহী রহ. হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর এই জবাবের সাথে সহমত প্রকাশ করেছেন এবং জোরদার সমর্থন করেছেন।

হালাল মনে করা এবং তার সাথে কাফেরদের মতো আচরণ করা জায়িয কি না?

উত্তর : যায়েদকে একেবারে কাফের মনে করা এবং কেবল প্রশ্নোল্লিখিত কাজের দরুন তার সাথে কাফেরদের মতো আচরণ করা জায়িয নয়। যে ব্যক্তি কেবল এসব কাজের দরুন তার সাথে কাফেরদের ন্যায় আচরণ করবে সে গুনাহগার হবে।

আর তাকবিয়াতুল ঈমানে যা-কিছু লেখা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা হলো– হাদীস শরীফে এসেছে, ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাহ, আর সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। অনুরূপভাবে কয়েকটি বর্ণনায় এসেছে, ধৈর্য-মহানুভবতা-উত্তম আখলাখ– এগুলো ঈমানের শাখা। অথচ অনেক দেখা যায় যে, এগুলোর মধ্য হতে কিছু গুণ কাফেরদের মধ্যেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ : অনেক কাফের লজ্জাশীল হয়ে থাকে, তাদের অনেকে উত্তম আখলাকের অধিকারীও হয়ে থাকে। কিন্তু ওই কাফেরের মধ্যে কেবল লজ্জা পাওয়া গেলেই আমরা তাকে মুমিন বলতে পারি না এবং তার সাথে মুসলিমদের মতো আচরণ করতে পারি না! তবে এতটুকু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, লজ্জা ঈমানের একটি শাখা এবং আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয় বস্তু। যদিও এই ব্যক্তি কাফের হওয়ার কারণে পছন্দনীয় নয়। তবে তার এই গুণটি পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়।

একইভাবে শিরক যেহেতু ঈমানের বিপরীত, তো সেটারও অবশ্যই এ পরিমাণ শাখ-প্রশাখা হবে। সুতরাং যায়েদকে যেমন শুধুমাত্র লজ্জার গুণ থাকার কারণে মুমিন বলা

যাবে না, যদিও লজ্জার প্রশংসা করতে হবে। অনুরূপভাবে কেবল গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে তাকে মুশরিক বলতে পারব না। যদিও তার এই কাজটিকে শিরকি কাজ গণ্য করতে হবে; এই কাজের উপর সর্বোচ্চ আপত্তি জানাতে হবে, কাজটিকে হেয় করতে হবে এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করতে হবে। কেননা সম্ভবনা আছে যে, এ ব্যক্তির মাঝে যেমন শিরকের এই শাখাটি রয়েছে, তেমনি অনেক ঈমানের শাখাও বিদ্যমান রয়েছে। অতএব সে ঈমানী শাখাগুলোর কারণে আল্লাহর কাছে মাকবুল হবে, যদি তার এই কাজটি পরিত্যাজ্য হবে।

এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজে লিপ্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে শরীয়তের মোকাবেলা না করবে। কিন্তু যদি সে শরীয়তে মুহাম্মাদী প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে, উদাহরণস্বরূপ এ কথা বলল যে, শরীয়তের সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই, বা বলল যে, সে অমুক কাজ অবশ্যই করবে, চাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট থাকুক বা না থাকুক, বা বলল যে, কাজটি তো শরীয়তে নিষিদ্ধ, তবে শরীয়ত তার জন্য নয়, বরং অন্যদের জন্য। তার ধর্ম হলো তরীকত, শরীয়ত নয়– তো তখন সে একেবারে কাফের হয়ে যাবে। ঈমানের যত শাখা তার মধ্যে থাকবে তা বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহর গযবে পতিত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তার গযব থেকে হেফাযত করুন।

মুহাম্মাদ ইসমাঈল উফিয়া আনহু
লেখক, তাকবিয়াতুল ঈমান
শাহজাহানাবাদ, ১২ জুমাদাল উলা ১২৪০ হি.

উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ বিন গিয়াসুদ্দীন দামাত বারাকাতুহুম-এর সাথে পরামর্শক্রমে গ্রন্থটির অনুবাদ শুরু করি। অনুবাদ শেষ হলে হুজুর পাণ্ডুলিপির শুরু থেকে কিছুঅংশ দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন এবং হিম্মত আফযায়ী করেছেন। আল্লাহ হুজুরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, সিহ্হত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘ হায়াত নসীব করুন এবং আমাদেরকে হুজুরের কাছ থেকে যথাযথ ইস্তেফাদা করার তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে শুকরিয়া জানাচ্ছি দেশের স্বনামধন্য দ্বীনী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ছাহেব দা. বা.-এর প্রতি। তিনি তার প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করেছেন। অনুরূপভাবে শুকরিয়া জানাই বন্ধুবর মাওলানা আবদুল্লাহ আল-মারূফ (সদস্য–দারুত তাসনীফ, মাকতাবাতুল আশরাফ)-সহ আরও যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলকে।

আল্লাহ তাআলা লেখক-অনুবাদক-প্রকাশকসহ সকলের খেদমতকে কবুল করুন। গ্রন্থটিকে সকলের পরকালীন নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন এবং মূলের ন্যায় অনুবাদকেও পথভোলা বান্দাদের হেদায়াতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. هٰذَا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

২২ যিলহজ্জ ১৪৪১ হিজরী
১৩ আগস্ট ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

মুহাম্মাদ আব্বাস হানীফ
খাদেম, জামিয়াতুল আযীয আলইসলামিয়া
ঢাকা উদ্যান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আরবী অনুবাদের ভূমিকা ২১
লেখকের জীবনী ২৯
রচনাবলি ৩১
মৃত্যু ৩২
লেখকের ভূমিকা ৩৩
ইবাদতের মূল ভিত্তিই সহীহ্ ঈমান ও আকীদা ৩৩
কুরআন থেকে বিরত রাখতে শয়তানি প্ররোচনা ৩৪
অসুস্থ ব্যক্তিই ডাক্তারের বেশি মুখাপেক্ষী ৩৬
ঈমানের দুটি অংশ ৩৬
অনুসৃত হবার উপযুক্ত কে? ৩৭
কিতাবের বিষয়বস্তু ও বিন্যাস ৩৭

শিরক ও অজ্ঞতার ভয়াবহ বিস্তার ৩৯-৫৪

শিরকের বিভিন্ন রূপ ও ধরন ৩৯
অজ্ঞ মুসলিম সমাজ কর্তৃক পূর্ববর্তী মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ ৪১
জাহিলী লোকদের শিরক ও গোমরাহীর স্বরূপ ৪৫
শিরকি বিভিন্ন আচার-কর্ম ৪৫
১. সর্বব্যাপী জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ ৪৭
২. নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং কামেল কুদরত আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ ৪৮
৩. ইবাদত সংক্রান্ত আমল ও নিদর্শনসমূহ একমাত্র
আল্লাহ্ তাআলার জন্য ৪৯
৪. দাসত্ব ও নতিস্বীকারনির্দেশক তাযীমসমূহ আল্লাহর সাথে খাস ৫১

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিরকের ভয়াবহতা ৫৫-৬৮

শিরক ও অন্যান্য গুনাহের মাঝে মৌলিক পার্থক্য ৫৫
প্রকাশ্য শিরক খোদাদ্রোহিতার শামিল,
যা আল্লাহর আত্মসম্মানবোধকে নাড়া দেয় ৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরক চরম জুলুম এবং কোনও বস্তুকে অপাত্রে রাখার শামিল	৫৭
আল্লাহ্ তাআলা কেবল ইখলাসপূর্ণ আমলই কবুল করেন, যেখানে অন্য কারও অংশ নেই	৫৯
রূহের জগতে গ্রহীত অঙ্গীকার	৬০
ফেতনা ও মুসিবতের সময় তাওহীদের আকীদাকে আঁকড়ে ধরে তার উপর অটল থাকা	৬৪
মনিব বিনে অন্য কারও দ্বারস্থ হওয়া গোলামের আত্মমর্যাদাহীনতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক	৬৫
তাওহীদবাদী গুনাহগার তাওবা করে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে, কিন্তু ইবাদতগুযার মুশরিক তা পারে না	৬৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিরক ফিল-ইলমের খণ্ডন	**৬৯-৮২**
পঞ্চইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক মানুষের জন্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত	৬৯
গায়েবের ইলম আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ এবং মানবীয় আওতাবহির্ভূত বিষয়	৭০
যে নিজের ব্যাপারে বা অন্য কারও ব্যাপারে স্বতন্ত্র ও স্থায়ীভাবে গায়েব জানার দাবি করে, সে মিথ্যুক ও পাপী	৭১
ভবিষ্যতের যেসব বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়	৭২
মানুষের অন্তরের বিষয় জানা সম্ভব নয়	৭৪
গায়েবি বিষয়ে সংবাদ প্রদানের দাবিদারদের স্বরূপ	৭৪
দুআর উদ্দেশ্যে দূর বা কাছ থেকে মৃতদের ডাকা ইলমের ক্ষেত্রে শিরকের নামান্তর	৭৫
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বাধীন ক্ষমতা রাখতেন না এবং স্বতন্ত্রভাবে গায়েবের ইলম জানতেন না	৭৭
নবী-ওলীগণের মর্যাদা স্বাধীন কর্মক্ষমতা এবং স্বতন্ত্রভাবে গায়েব জানার মধ্যে নিহিত নয়	৭৮
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে গায়েব জানার সম্বন্ধ করায় আপত্তি করেছেন, এমনকি কবিতায়ও	৭৯

বিষয় **পৃষ্ঠা**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শির্ক ফিত-তাসাররুফের খণ্ডন ৮৩-১০১

সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য প্রমাণিত, এ ব্যাপারে সর্বকালের মানষের ঐকমত্য ৮৩

আল্লাহর ব্যাপারে জাহিলী সমাজের আকীদা ও তাদের শিরকের স্বরূপ ৮৪

নবী-ওলীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মুশরিকদের অনুকরণ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি ৮৪

নবী-ওলী পৃথিবীতে স্বাধীন হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম ৮৫

সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজা-বাদশাদের রীতিনীতি ও সুপারিশকারীদের শ্রেণিবিভাগ ৮৬

সুপারিশগ্রহণ ও প্রভাবশালীদের সন্তুষ্টকরণের ক্ষেত্রে দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের সাথে আল্লাহর কোনও তুলনা চলে না ৮৮

আল্লাহ তাআলার দরবারে যেসব সুপরিশ চলবে না ৮৮

ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য সুপারিশ ৯২

দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের বিপরীতে, আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ হয়ে সহযোগিতা চাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই ৯৫

আল্লাহর নেক বান্দারা আল্লাহর নিকট দুআ ও প্রার্থনা ছাড়া কোনওকিছুর ক্ষমতা রাখে না ৯৭

তাওহীদবাদী মুমিন হন আত্মনিয়ন্ত্রিত ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আর দুর্বলবিশ্বাসী হয়ে থাকে পেরেশান ও বিক্ষিপ্ত চিন্তার অধিকারী ৯৭

ছোট-বড় সকল বিষয়ে আল্লাহর দ্বারস্থ হওয়া যায়; দুনিয়ার রাজা-বাদশারা যেভাবে দেশ পরিচালনা করে তিনি সেভাবে করেন না ৯৯

বংশ ও আত্মীয়তার উপর নির্ভর করে আমলবিমুখ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর আত্মীয়দের সতর্কীকরণ ১০০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক-এর খণ্ডন ১০২-১২২

শিরক ত্যাগ করে খাঁটি তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার দাওয়াত আদিকাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে ১০২

বিষয় পৃষ্ঠা

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনও ধরনের সিজদা করা জায়িয নয় ১০৩

নেককার-বুযুর্গদের ক্ষেত্রে লোকদের অতিভক্তি ও গোমরাহী ১০৫

হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি ও চূড়ান্ত স্তরের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও আত্মবিস্মৃতির নিদর্শনাবলি একমাত্র বাইতুল্লাহ ও হারাম শরীফের জন্য প্রযোজ্য ১০৬

বুযুর্গদের জন্য প্রাণী উৎসর্গ করা, সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নৈকট্য লাভ করা এবং তাদের জন্য এসব প্রাণী মানত ও জবাই করা– সবই হারাম ১০৮

অসংখ্য অংশীদার ও নামসর্বস্ব দেবদেবী ১০৯

শান্ত ও বিনয়াবনত হয়ে চূড়ান্ত স্তরের তাযীম একমাত্র আল্লাহর হক ১১৩

তোমরা কি স্বহস্তে নির্মিত বস্তুর উপাসনা করছ? ১১৩

নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে জবাই একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশেষিত ১১৬

জাহিলী আচার-প্রথা ও আকীদা-বিশ্বাস শেষ যামানায় আবার ফিরে আসবে ১১৭

আখিরী যামানায় শয়তানি ফেতনা ১১৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শিরক ফিল-আদাতের খণ্ডন ১২৩-১৬৮

পৌত্তলিক দর্শন ও দুর্বল মস্তিষ্কসমূহের নারীআসক্তি এবং এক্ষেত্রে মুসলমান কর্তৃক মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ ১২৩

শয়তানের কুমন্ত্রণায় আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতিসাধন ১২৫

মুশরিকদের আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার এবং গাইরুল্লাহর তাযীম ও শোকর আদায়ের বিচিত্র পদ্ধতি ১২৬

আল্লাহকে মাপে কম দেওয়া এবং অন্যদেরকে তাঁর উপর প্রাধান্য দেওয়া ১২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
শরীয়ত নয় এমন জিনিসকে শরীয়ত বানানো এবং জরুরি নয় এমন বস্তুকে জরুরি মনে করা	১২৯
পৃথিবীতে বিভিন্ন তারকার প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক	১৩২
গায়েবের সংবাদদাতা ও গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আস্থা রাখা কুফরি	১৩৪
জাহিলী সমাজ ও তার অনুসারী মুসলিমদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার নিদর্শনসমূহ	১৩৫
আল্লাহর শানে অজ্ঞতা ও বেয়াদবিপূর্ণ কথাবার্তার উপর চুপ থাকা জায়িয নয়	১৪১
নামের মধ্যে তাওহীদের নিদর্শন ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহপ্রদান এবং অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত কথার ব্যাপারে সতর্কীকরণ	১৪৭
গাইরুল্লাহ্‌র নামে কসম খাওয়া শিরক	১৫১
গাইরুল্লাহ্‌র জন্য মানত করা এবং যেখানে কোনও দেবতা বা জাহিলী যুগের মেলা বসত এমন স্থানে জবাই করা জায়িয নয়	১৫৩
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাযীমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির নিষেধাজ্ঞা	১৫৫
শিরকের সন্দেহযুক্ত শব্দাবলির ব্যাপারে সতর্কীকরণ	১৫৯
খ্রিষ্টানরা তাদের নবীর প্রশংসায় যে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে, তার অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা	১৬০
নেককারদের ছবি-মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা	১৬৪
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যে বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন তারচেয়ে বাড়িয়ে বললে তিনি কষ্ট পান	১৬৬

শিরকের ভয়াবহতা

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচের যে-কোনও গুনাহ্ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, সে (সঠিক পথ থেকে) বহু দূরে সরে যায়’। –সূরা নিসা, আয়াত ১১৬

আরবী অনুবাদের ভূমিকা

–হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَصَحْبِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِيْنِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُهْتَدِيْنَ، وَالدُّعَاةِ الْمُصْلِحِيْنَ، اَلْمُجَدِّدِيْنَ لِهٰذَا الدِّيْنِ، اَلَّذِيْنَ لَمْ يَزَالُوْا يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ، جَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ، أَفْضَلَ مَا جَزَى الْعُلَمَاءَ الرَّاسِخِيْنَ، اَلنَّائِبِيْنَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

দীর্ঘকাল থেকে আমরা এমন একটি কিতাব প্রকাশের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে আসছিলাম, যার মানহাজ হবে স্বচ্ছ, ভাষা হবে অত্যন্ত সাবলীল, ভূমিকা হবে খুবই সুন্দর, সর্বোপরি কিতাবটি হবে সহজবোধ্য। কিতাবটির প্রতিটি ছত্র থেকে রচয়িতার ইখলাস ও সত্যনিষ্ঠা প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তাআলা যে লক্ষ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং যে উদ্দেশ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁরই জন্য কেবল ইবাদত করা, তাঁকেই ভয় করা ও তাঁর কাছেই আশা করা, সাহায্য কেবল তাঁর কাছেই চাওয়া এবং তাঁর নিকটই কাকুতিমিনতি করা ইত্যাদি—এগুলো সম্পর্কে সমসাময়িক লোকদের অজ্ঞতা দেখে এবং যেসব আকীদা-বিশ্বাস ও রসম-প্রথাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আসমানী ধর্মসমূহ আগমন করেছে ও যেগুলো থেকে মুক্ত করার জন্য কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছে ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন সেসবের ছড়াছড়ি দেখে লেখকের মনে যে ব্যথা সৃষ্টি হয়েছে কিতাবের পাতায় পাতায় তা ঠিকরে পড়বে।

১৩৯৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে মদীনায় অবস্থানকালে শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর কিতাব তাকবিয়াতুল ঈমানের আরবী অনুবাদ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.-কে নির্দ্বিধ সিদ্ধান্তে পৌছে দেন। কারণ এই কিতাবটি তাওহীদের দাওয়াত ও সত্যপ্রকাশের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ভারত উপমহাদেশের কত লোককে-যে এর মাধ্যমে উপকৃত করেছেন তার কোনও ইয়ত্তা নেই। নিঃসন্দেহে তাদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন হবে।

তৎকালীন মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরত্ব, হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রতি নমনীয়তা ও জাহিলী আচার-প্রথার প্রতি ঝুঁকে পড়া দেখে লেখক যারপরনাই ব্যথিত ও মর্মাহত হন। কিতাবটি তাঁর সেই আহত ও ক্ষতবিক্ষত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে। কিতাবের প্রভাব ও মাকবূলিয়ত আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ইসলামের জন্য লেখকের অশ্রু-ক্রন্দন এবং জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত করে দ্বীনের পূনর্জাগরণ ও কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হুকুমত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর রক্ত-বিসর্জন।

তিনি দুআর সাথে দাওয়াত দিয়েছেন, জিহাদের সাথে চেষ্টাপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন এবং সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানের সাথেসাথে সত্যের জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন। এসব সম্ভব হয়েছে খাঁটি তাওহীদ, চূড়ান্ত ইখলাস এবং পূর্ণ সততা ও বিশ্বস্ততার বদৌলতে। আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন–

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

'মুমিনদের মধ্যেই এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের (প্রাণের) নাজরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে, আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি'।[৩]

---

৩. সূরা আহযাব, ২৩

এসব কারণে তাঁর কিতাবের প্রভাব, খ্যাতি ও প্রচার-প্রসার এত বেশি হয়েছে, যা কেবল বড় বড় মুখলিস আলেমে বাআমলের কিতাবাদির ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

* * *

এই কিতাবের শক্তিমত্তার রহস্য হলো কিতাবটি বাস্তবতাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছে, যথাযথভাবে রোগ নির্ণয় করেছে এবং শিরকের বিভিন্ন নিদর্শন ও পদস্খলনের স্থানসমূহ চিহ্নিত করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে কিতাবটি উম্মতের শিরায় হাত রেখে আকীদার দুর্বলতা নির্ণয় করতে পেরেছে এবং মুসলিমদের মাঝে পীর-বুযুর্গদের সম্মানের ক্ষেত্রে যে সীমালঙ্ঘন দেখা দিয়েছে এবং পৌত্তলিক সমাজ ও জাহিলী আচার-প্রথার যে বিস্তার ঘটেছে, তা যথাযথ ধরতে পেরেছে।

মানুষের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের রোগ-সমস্যাগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা না হয় এবং তারা যেসব আচার-প্রথায় আক্রান্ত হয়ে গেছে ও যেসব ব্যক্তি, স্থান ও নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে, সেগুলোকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সাধারণ ওয়াজ-নসীহত ও লিখনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, বরং সেগুলোকে তারা উপেক্ষা করে চলে এবং ভাবভঙ্গিমায় প্রকাশ করে যে, ওই বক্তা বা লেখক তাদেরকে উদ্দেশ্য করেনি, তারা তো পূর্বের মুশরিক ও জাহিলী যুগের মূর্তিপূজকদেরকে উদ্দেশ্য করেছে!

কিন্তু এই লেখক যেহেতু তাদের বাস্তব জীবনকে স্পর্শ করেছে, তাদের ভেতরের রোগ-ব্যাধির উপর হাত রেখেছে এবং তাদের ফেতনায় আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নত করেছে, তাই তাদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বরং তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়েছে।

আসলে গভীর অনুভূতিতে সমৃদ্ধ চিন্তাশীল-মুখলিস প্রত্যেক দাঈর অবস্থাই এমন হয়, যিনি কুরআনের স্বাদ আস্বাদন করেছেন এবং

দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীদের পথ-পন্থাকে যথাযথ ধরতে পেরেছেন। ফলে মানুষ খুশি হবে নাকি বেজার হবে, তার কোনও পরোয়া করেন না। তার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় কুরআনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া, তার রব্বকে খুশি করা এবং নিজের দায়িত্ব পালন করে অন্তরকে প্রশান্ত করা।

দ্বিতীয় শতাব্দির সূচনালগ্নে মুসলিম সমাজে ও মুসলিমদের মন-মস্তিষ্কে ইমাম হাসান বসরীর প্রভাব এবং তাঁকে উপেক্ষা করতে না পারার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি 'রিজালুল ফিকরি ওয়াদ্দাওয়াহ' গন্থে যা লিখেছি, সেটা এখানে উল্লেখ করে দেওয়া সমীচীন মনে হচ্ছে। আমি লিখেছি–

> 'তিনি স্পর্শকাতর শিরায় আঘাত করেছেন, সমাজের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগ নির্ণয় করেছেন এবং দয়ালু, কোমল ও কল্যাণকামী ডাক্তারের ন্যায় সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমাজে অসংখ্য দাঈ এবং ওয়ায়েজ ছিল, কিন্তু সমাজ তাঁর প্রতি যেভাবে ঝুঁকেছে সেভাবে আর কারও প্রতি ঝুঁকেনি। কারণ তিনি তাদের অন্তরকে স্পর্শ করেছেন এবং জীবনের গভীরে প্রবেশ করে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন'।[৪]

* * *

এসব কারণে আমরা এই কিতাবটিকে সহজ-সাবলীল ও যুগোপযোগী রীতিতে আরবী ভাষায় অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছি।

আর শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. চেয়েছেন, এই কাজের সূচনাটা যেন মসজিদে নববীতে হয়। ১৩৯৩ হিজরীর যিলহজ্জের শেষে এক বরকতময় মুহূর্তে, বুধবার মধ্য দুপুরের পূর্বক্ষণে আল্লাহ তাআলা সেটার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি ভূমিকার প্রথম কয়েক লাইন বাবে রহমত ও বাবে জিবরীলের মধ্যবর্তী একটি স্থানে বসে লিখেছি, যা তখন আগন্তুক হাজী সাহেবান ও তাসবীহ-দরূদে মশগুল বান্দাদের দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল, আর পরিবেশটি ছিল শান্ত, নীরব ও মুহাব্বতপূর্ণ।

---

[৪] পৃ. ৬৩-৬৪, দামেস্ক ইউনিভার্সিটির প্রেস থেকে মুদ্রিত।

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি যে, এই কাজের সূচনাটি এই মসজিদে হয়েছে, যা থেকে এই নূর চারদিকে ছড়িয়েছে এবং তাওহীদ ও দাওয়াত ইলাল্লাহর তরঙ্গ বিশ্বের আনাচকানাচে পৌঁছেছে। অতঃপর অন্ধকারকে দূরিভূত করেছে, অন্তরসমূহকে ঈমান ও নূরে-তাওহীদের ফয়েজ দ্বারা সিঞ্চিত করেছে, আত্মাগুলোকে পরিশুদ্ধ করেছে, জমিন তার প্রভুর আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে।

আল্লাহ তাআলা স্বল্প সময়ে সাধ্যমত কাজটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিন। সকল প্রশংসা আল্লহ তাআলার জন্য যার কুদরতে সকল নেক কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

* * *

এখানে সাইয়্যেদ আবদুল হাই হাসানী (১৩৪১ হিজরী) রহ.-এর 'নুযহাতুল খাওয়াতির' থেকে চয়ন করে লেখক শাহ ইসমাঈল শহীদের জীবনীটা উল্লেখ করে দেওয়া সমীচীন মনে হচ্ছে, যেন পাঠক জানতে পারে যে, উলূমে দ্বীনিয়ায় লেখকের অবস্থান কত উঁচু ও মজবুত ছিল। ইসলামের জন্য তার কী পরিমাণ কুরবানী ছিল এবং আকীদার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তিনি কতটা আপোষহীন ছিলেন। যথার্থই বলা হয়েছে, 'রচয়িতার জীবনী মূলত রচনার বংশপরিচয়'। এ কারণে মুসলিম লেখকবৃন্দ জীবনী বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং অনেক উপকার করেছেন।

এতে আমরা কিছু উপশিরোনাম যোগ করেছি এবং হিন্দুস্তানী কিছু শব্দ, রসম-প্রথা ও ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরেছি, যেন আরবী পাঠকের জন্য (অনুরূপ বাংলাভাষী পাঠকের জন্যও) কিতাবটি সহজবোধ্য হয়।

অনুরূপভাবে কিতাবের এমন কিছু বাক্য ও বাচনভঙ্গির সমর্থনে উম্মাহর বিশিষ্ট উলামার কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি, যেগুলোর সাথে অনেক লোকই অপরিচিত। আর তাদের এই অপরিচিতির কারণ

হলো, সাম্প্রতিককালে প্রচলিত সংশোধনের রীতি-পদ্ধতি, যার ভিত্তি হলো মানুষের আবেগ ও ওরফের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ওপর।

ইসলাহের এই উদার পন্থা অবলম্বনের পেছনে যে মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে তা হলো, দাওয়াতকে গভীর করার পরিবর্তে তার পরিধি প্রশস্ত করাকে প্রাধান্য দেওয়া, আকীদাকে মজবুত করার তুলনায় তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা এবং ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর উপর উপকারলাভকে প্রাধান্য দেওয়া। তাছাড়া মানুষের বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হওয়ার আশঙ্কা। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, যার সে অনুসরণ করে থাকে।

পাঠক এই কিতাবে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা এবং হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আচার-প্রথার বিবরণ থেকে জানতে পারবেন যে, হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জাহিলী ও স্থানীয় আচার-প্রথা হিন্দুস্তানের মুসলিম সমাজের কত গভীরে প্রবেশ করেছে এবং এ দেশের মুসলিমরা হিন্দু ও ব্রাহ্মণ দর্শনের প্রতি কতটা ঝুঁকে পড়েছে।

পুরনো ইতিহাসের পাঠকমাত্র অবগত আছেন যে, আল্লাহর জমিনে পৌত্তলিকতায় সবচেয়ে বেশি নিমজ্জিত দেশ হলো হিন্দুস্তান। হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতা সবচেয়ে প্রাচীন এবং মৌলিক, পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক দেশে তা হলো নবাগত। হিন্দুস্তানের ধর্মশাস্ত্র তো আছেই, এছাড়াও এ দেশের দর্শন থেকে নিয়ে সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, জোর্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, বর্ষপঞ্জিকা পর্যন্ত সবকিছুই এই পৌত্তলিকতা দ্বারা মথিত হয়েছে। হিন্দুস্তান হলো শত সহস্র দেব-দেবীর ভূমি এবং পৌরাণিক গল্প-কাহিনীর উর্বর জমি। এখানে রয়েছে অসংখ্য উৎসব-পার্বণ আর ধর্মীয় ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন কাল্পনিক জাতীয় বীরদের স্মরণে অগণিত শোক-সমাবেশ।

এই সবকিছুই মুসলিমদের জীবন ও আচার-অনুষ্ঠানে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং দিন যত গড়িয়েছে বিষয়টি ততই গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। আর শাসকবর্গের অবহেলা, হাদীস-সুন্নাহর চর্চা ও প্রচলন

কম থাকা এবং অমুসলিম প্রতিবেশীদের সাথে একই শহর-গ্রাম-গলিতে দীর্ঘ সহাবস্থানের কারণে হক-বাতিল মিশ্রিত হয়ে একাকার হয়ে গেছে।

এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা কুরআন-সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এক দল উলামায়ে দ্বীন ও দাঈকে প্রস্তুত করে দিলেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে আবদুল আহাদ সারহেন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও তাঁর খলীফাগণ। তাঁর পরে হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁদের ছাত্রদের মধ্য থেকে অসংখ্য ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বিজ্ঞ উলামাগণ।

এই বিষয়ে কারও বেজার হওয়ার কিংবা সমালোচনার পরোয়া না করে লেখকের স্পষ্টবাদী ও সংবেদনশীল হওয়ার একটি বড় কারণ এটাই। কারণ তিনি খাঁটি হিন্দুস্তানী পরিবেশে এবং এই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে বেড়ে উঠেছেন। যদি তাঁর হায়াত দীর্ঘায়িত হত এবং তিনি হিন্দুস্তানে অবস্থান করে দাওয়াতের সুযোগ পেতেন, তাহলে বিষয়টিকে ধাপে ধাপে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি হিন্দুস্তান ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, জিহাদ ও শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহর অদম্য স্পৃহা তাকে বাধ্য করেছিল।

তিনি এই কিতাবটি রচনা করে গেছেন হুজ্জত পূর্ণ করার জন্য এবং দায়মুক্তির উদ্দেশ্যে। এবং এটাকে এমন এক বাণী বানিয়ে দিলেন, যা পরবর্তীদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকবে, যাতে মানুষ শিরক থেকে ফিরে আসে।

* * *

এই বিষয়টি কেবল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত হিন্দুস্তানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দিতে আরব দেশ ও মুসলিম রাজধানীসমূহে ইসলামী আকীদা তার অনেকখানি শক্তি হারিয়ে এলোমেলো হয়ে পড়েছে এবং অনেক বিদআত ও ভ্রষ্টতা এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

এর কারণ ছিল কয়েকটি। যেমন– বিভিন্ন অনৈসলামী রসম-রেওয়াজে আক্রান্ত নওমুসলিম অনারব গোত্রের প্রভাব, অনারব ও অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের অবাধ মেলামেশা, মিশর ও শামে বাতিনিয়া এবং ইসমাঈলিয়াদের শাসন ও তাদের প্রভাব। সাথে ছিল কিছু মূর্খ সূফীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার।

কেউ যদি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. রচিত 'আর-রদ আলাল বাকরী' এবং 'আর-রদ আলাল আখনায়ী' পড়েন তাহলে তৎকালীন সময়ে মূর্খদের মাঝে পীর-মাশায়েখ ও বুযুর্গদের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি ছিল এবং তারা যেসব ভ্রান্ত আকীদা ও জাহিলী আচার-প্রথায় আক্রান্ত ছিল, তার অনেককিছুই জানতে পারবেন।

সেই বাড়াবাড়ি ও ভ্রান্ত আকীদার অনেক প্রভাব এখনো পর্যন্ত আরবদের মাঝে বাকি রয়ে গেছে। যার জন্য হেকমতের সাথে বলিষ্ঠ ভাষায় মজবুত দাওয়াতের প্রয়োজন। এ কারণে এই কিতাবের ফায়দা কেবল হিন্দুস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এমন প্রতিটি জায়গার জন্য প্রযোজ্য, যেখানে শয়তান প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং ইসলামবিরোধী বিভিন্ন আকীদা ও আচার-প্রথা ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি আরবী অনুবাদের নাম দিয়েছি– রিসালাতুত তাওহীদ লিল-আল্লামা আশ-শাইখ ইসমাঈল আশ-শহীদ। কারণ বিষয়বস্তুর বিচারে এই নামই বেশি উপযুক্ত। যদিও লেখক নিজেই 'রদ্দুল ইশরাক' (শিরকের খণ্ডন) নামে মূল কিতাবটির আরবী অনুবাদ করিয়েছেন, তবে মূল আরবী কিতাবটির কোনও হদিস পাওয়া যায় না। আমাদের নামটি মূল নামের বেশি কাছাকাছি।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি এই অনুবাদের মাধ্যমে তেমনই উপকৃত করেন যেমন মূল কিতাব দ্বারা করেছেন এবং এর দ্বারা মুমিনদের অন্তর খুলে দেন।

আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নদভী
১ রবিউল আউয়াল ১৩৯৪ হিজরী

লেখকের জীবনী

–হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

মুজাহিদে ইসলাম শাইখ আল্লামা ইসমাঈল শহীদ ইবনে আবদুল গনী ইবনে ওলীউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম উমরী দেহলভী। মেধা, বিচক্ষণতা, সাহস, হিম্মত ও দ্বীনের ব্যাপারে অবিচলতা ও আপোষহীনতার ক্ষেত্রে তিনি দুনিয়ার এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তিনি ১১৯৩ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়ালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তার পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তিনি চাচা শাইখ আবদুল কাদের ইবনে ওলীউল্লাহ দেহলভীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন এবং তার কাছেই পাঠ্যতালিকার কিতাবাদি পড়েন। অনুরূপভাবে অপর দুই চাচা শাইখ রফীউদ্দীন ও শাইখ আবদুল আযীযের কাছ থেকেও পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং দীর্ঘকাল তাদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ফলত তিনি আকলী ও নকলী উভয় ইলমে অথৈ সাগর পরিণত হন।

অতঃপর তিনি ইমাম শহীদ সাইয়্যেদ আহমাদ ইবনে ইরফান বেরেলভী রহ.-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং তার কাছ থেকে তাসাওউফের দীক্ষা লাভ করেন। ১২৩৭ হিজরীতে তার সাথে হারামাইনের সফরে যান এবং হজ্জ ও যিয়ারত শেষ করে তার সাথেই হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। এসে তার নির্দেশে (দ্বীনী দাওয়াতের উদ্দেশ্যে) দুই বছর বিভিন্ন শহর-উপশহর-গ্রাম চষে বেড়ান। তখন তার কাছ থেকে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়।

তারপর ১২৪১ হিজরীতে সীমান্তবর্তী এলাকায় সফর করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন। তিনি সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদের

উজির ও উপদেষ্টার মত ছিলেন। সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতেন এবং বড় বড় যুদ্ধে নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। পরিশেষে ইয়াগিস্তানের বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন।

তিনি ছিলেন যামানার বিস্ময় এবং এক বিরল প্রতিভা। ছিলেন ভেতরে-বাহিরে আল্লাহমুখী, তালীম ও ইবাদতে সদা মশগুল, বিনয়ী ও সজ্জন, মহৎ ও পবিত্র, সাহসী ও দ্বীনী বিষয়ে অনড়, শুদ্ধভাষী ও জ্বালাময়ী বক্তা। কোনও সংশয়বাদী বা বিচ্যুত স্বভাবের লোক তার সাথে যখন বসত, তিনি তার জাদুময়ী বয়ান দ্বারা আগুন-পানিকে একাকার করে দিতেন। ফলে ওই ব্যক্তি প্রস্থানের সময় তার কাছ থেকে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় নিত।

সমসাময়িক লোকদের সাথে তার কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল এবং তার ব্যাপারটি একটি বহুলালোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তাকে কেন্দ্র করে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে বেশকিছু ফেতনা হয়েছে। তার ব্যাপারে লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল তার প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আরেকদল তার শানে বাড়াবাড়ি করেছে। আর প্রত্যেক কালজয়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

শাইখ মুহসিন ইবনে ইয়াহইয়া তুরহাতী 'আল-ইয়ানিউল জানী' গ্রন্থে বলেন– তিনি ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর, সুন্নাহ রক্ষায় আপোষহীন। সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত দিতেন, সুন্নাহ পরিত্যাগ করলে রাগ করতেন এবং বিদআত ও বিদআতীদের কঠোর সমালোচনা করতেন।

'আল-হিত্তাহ বিযিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ' গ্রন্থে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভীর আলোচনা করতে গিয়ে সিদ্দীক হাসান খান কন্নৌজী বলেন– তার নাতী মৌলভী মুহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ কথায় ও কর্মে তার দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং দাদার অসমাপ্ত কাজ আঞ্জাম দিয়ে তার দায়িত্ব আদায় করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার নেক কাজের উত্তম পুরস্কার দান করুন। তিনি ইসলামে কোনও নতুন

পন্থা আবিষ্কার করেননি, যেমনটি মূর্খরা মনে করে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ
كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ
وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ٧٩

‘কোনও মানুষের জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে তা সত্ত্বেও মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। এর পরিবর্তে (সে তো এটাই বলবে যে,) তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, তোমরা যে কিতাব শিক্ষা দাও ও যা-কিছু নিজেরা পড়, তার ফলস্বরূপে’।[৫]

তিনি অনেক মৃত সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং অনেক শিরক ও বিদআতকে নির্মূল করেছেন। পরিশেষে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন এবং আকাঙ্খার চূড়ান্ত শিখরে উপনীত হয়েছেন।

রচনাবলি

তিনি বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার হলো ‘আস-সিরাতুল মুস্তাকীম’। ফারসী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে মূলত তার শাইখ সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদের বাণী ও আমল সংকলন করেছেন। এতে দুটি অধ্যায় রয়েছে তার শাগরেদ শাইখ আবদুল হাই ইবনে হেবাতুল্লাহ সিদ্দীকী বুরহানভী রচিত।

২. ‘ইযাহুল হাক্কিস সরীহ ফী আহকামিল মাওতা ওয়াদ্দরীহ’। এতে সুন্নাত-বিদআতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।
৩. ‘মানসাবে ইমামাত’। নবুওয়াত ও ইমামাতের মাকাম ও মানসিবের তাহকীকে অদ্বিতীয় একটি কিতাব।
৪. ‘মাবহাসু ইমকানিন নাযীরি ওয়ামতিনা‘ঈন নাযীর’ (পুস্তিকা)। এগুলো সবই ফারসী ভাষায় রচিত।

---

[৫] সূরা আলে ইমরান, ৭৯

৫. উসূলে ফিকহ বিষয়ে একটি আরবী মুখতাসার।
৬. রদ্দুল আশরাকি ওয়াল বিদা'। আরবী রিসালাটি দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন।
৭. তানবীরুল আইনাইন ফী ইসবাতি রফঈল ইয়াদাইন (আরবী)।
৮. সিলকে নূর (উর্দূ)। বিবিধ বিষয়ে।
৯. তাকবিয়াতুল ঈমান। উর্দূ ভাষায় তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এটা মূলত 'রদ্দুল আশরাকি ওয়াল বিদা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ।
১০. 'আবাকাত'। দর্শন ও হিকমত শাস্ত্রে রচিত। এতে তার মেধা ও এই শাস্ত্রে তার সক্ষমতা ফুটে উঠেছে।[৬]

স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ খান 'আসারুস সানাদীদ' গ্রন্থে বলেন– তিনি মানতিক শাস্ত্রে একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যাতে তার দাবি ছিল যে, শাক্‌লে রাবে' হলো সবচেয়ে সহজবোধ্য আর শাকলে আউয়াল তার বিপরীত। এই দাবির স্বপক্ষে তিনি এমনসব দলীল হাজির করেছেন, সমসাময়িকদের মধ্যে কেউ সেগুলো খণ্ডন করার সাহস করেনি।

মৃত্যু

১২৪৬ হিজরীর ২৪ যিলকদে বালাকোট রণাঙ্গনে তিনি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ করেন। তার কবর সেখানে সুপরিচিত।[৭]

---

[৬] মাওলানা সাইয়্যেদ মানাযির আহসান গীলানী রহ. একই নামে এর উর্দূ অনুবাদ করেছেন। বর্তমানে এই অনুবাদটি পাওয়া যায়। অনলাইনে এর পিডিএফও সহজলভ্য। –অনুবাদক

[৭] আল্লামা সাইয়্যেদ আবদুল হাই হাসানী রহ-এর 'নুযহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামিয়ি ওয়ান নাওয়াযির' গ্রন্থের ৭ম খণ্ড থেকে সংগৃহিত।

লেখকের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে আল্লাহ, আপনার পবিত্র সত্তার হাজার শোকর। আপনি আমাদেরকে হাজারো নেয়ামত দান করেছেন। আপনার সত্য দ্বীন বাতিয়েছেন। সরল পথ দেখিয়েছেন। খাঁটি তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে শামিল করেছেন এবং তাঁর আদর্শ ধারণ করার আগ্রহ দান করেছেন। তদুপরি তাঁর স্থলাভিষিক্তদের মুহাব্বাত অন্তরে দান করেছেন, যারা তাঁর পথ বাতলে দেয় এবং তাঁর আদর্শের উপর লোকদের পরিচালিত করে।

হে আল্লাহ! আপনার হাবীব, তাঁর পরিবার, সাহাবা এবং সে সকল স্থলাভিষিক্তদের উপর হাজারো দরূদ-সালাম বর্ষণ করুন। তাঁর অনুসারীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমাদেরকে তাঁদের সাথে শরীক করুন। জীবনে-মরণে তাঁদেরই পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, তাঁদেরই অনুসারীদের মধ্যে গণ্য করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ক. ইবাদতের মূল ভিত্তিই সহীহ ঈমান ও আকীদা

সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। বান্দার কাজ বন্দেগী করা। যে বান্দা বন্দেগী করে না সে বান্দা নয়। আর আসল বন্দেগী হলো ঈমান সহীহ করা। কেননা যার ঈমানে ভেজাল থাকে তার কোন বন্দেগী কবুল হয় না। পক্ষান্তরে যার ঈমান সরল ও নির্ভেজাল তার সামান্য বন্দেগীও অনেক। অতএব প্রতিটি মানুষের উচিত, ঈমান সহীহ করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা এবং সর্বাগ্রে তা অর্জন করা।

এ যুগে মানুষ দীনি বিষয়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে চলছে। কেউ পূর্ববর্তীদের রসম-রেওয়াজকে আঁকড়ে আছে। কেউ বুযুর্গদের কিচ্ছা-কাহিনীর পিছনে পড়ে আছে। আবার কেউ নামধারী মৌলভীদের মনগড়া কথাবার্তাকে নিজেদের জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করছে। একদল আবার এমনও আছে, যারা নিজেদের আকলের পিছনে ছুটেছে।[৮]

অথচ সর্বোত্তম পন্থা হলো, মানুষ কুরআন-হাদীসকে মূল জ্ঞান করবে এবং নিজের পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর বুযুর্গদের যেসব ঘটনা বা মৌলভীদের[৯] যেসব কথাবার্তা কুরআন-হাদীসের সাথে মিলবে সেগুলো গ্রহণ করবে আর যেগুলো কুরআন-হাদীসের বিপরীত হবে সেগুলো অনুযায়ী পরিচালিত হবে না বরং সম্পূর্ণরূপে তা পরিত্যাগ করবে।

খ. কুরআন থেকে বিরত রাখতে শয়তানি প্ররোচনা

বর্তমানে জনসাধারণের মাঝে একটি কথা খুব প্রচলিত আছে যে, কুরআন-হাদীসের কথা বোঝা অনেক কঠিন। এগুলো বুঝতে হলে অনেক ইলমের প্রয়োজন। আমাদের এই সামর্থ্য কোথায় যে, আমরা কুরআন-হাদীসের কথা বুঝতে সক্ষম হব? আর কুরআন-হাদীস অনুযায়ী চলা তো বুযুর্গদের কাজ! আমাদের এই সামর্থ্য নেই যে, কুরআন-হাদীস অনুযায়ী চলব! অতএব আমাদের জন্য এসব প্রচলিত (কিচ্ছা ও মৌলভীদের) কথাবার্তাই যথেষ্ট!!

---

[৮] অথচ আকায়েদ ও শরঈ হুকুম-আহকাম কেবল আকল বা যুক্তির উপর কখনো প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ ক্ষেত্রে কেবল মেধা ও মস্তিষ্কের জোর কোন উপকারে আসে না। বরং এগুলোর একমাত্র উৎস হলো ওহী-ইলহাম এবং নবী-রাসূলদের শিক্ষা। –নদভী

[৯] এখানে উদ্দেশ্য হলো বেদআতপন্থী এবং গ্রাম-গঞ্জের স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মৌলভীরা। কারণ বিজ্ঞ আলেমগণ তো কুরআন-হাদীস অনুযায়ীই বলবেন।

জনসাধারণের এই কথাটি একেবারেই গলদ (ভুল)। এ জন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, কুরআনের কথা খুবই স্পষ্ট, এটা বোঝা কঠিন নয়। সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

'নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আর সেগুলোকে অস্বীকার করে কেবল অবাধ্যরাই'।[১০]

অর্থাৎ কুরআনের কথা বোঝা কঠিন কিছু নয়। বরং এর উপর চলা নফসের জন্য কঠিন। এ কারণে যে, কারও আনুগত্য করতে নফসের কাছে খারাপ লাগে। এ জন্য যেসব লোক অবাধ্য তারাই এর সহজ হওয়াকে অস্বীকার করে।

আর কুরআন-হাদীসের কথা বুঝতে অনেক ইলমের প্রয়োজন হয় না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অজ্ঞদের পথ প্রদর্শন, মূর্খদের বোঝানো এবং ইলম-বঞ্চিতদেরকে ইলম শেখানোর জন্যই আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা সূরা জুমুআয় ইরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾

'তিনি (আল্লাহ)-ই উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে, যদিও তারা এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত ছিল'।[১১]

সুতরাং এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত যে, তিনি এমন রাসূল পাঠিয়েছেন যিনি উদাসীনদের সচেতন করেছেন, নাপাকদের পাক করেছেন, মূর্খদের ইলম শিখিয়েছেন, নির্বোধদের বোধোদয় ঘটিয়েছেন আর পথহারাদের দিয়েছেন সরল পথের দিশা।

---

[১০] সূরা বাকারা, ৯৯

[১১] সূরা জুমুআ, ২

অতএব এই আয়াত শোনার পরেও যে বলবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আলেমগণ ছাড়া আর কেউ বুঝতে সক্ষম নয় এবং বুযুর্গরা ছাড়া আর কেউ তাঁর পথে চলার সামর্থ্য রাখে না, সে মূলত এই আয়াতকেই অস্বীকার করল এবং এই নেয়ামতের নাশোকরী করল। বরং বাস্তবতা হলো মূর্খরা তাঁর কথা আত্মস্থ করে আলেম হয়ে যায় এবং পথহারা লোক তাঁর পথে চলে বুযুর্গ বনে যায়।

গ. অসুস্থ ব্যক্তিই ডাক্তারের বেশি মুখাপেক্ষী

তাদের এই কথার দৃষ্টান্ত হলো, একজন বড় ডাক্তার আর একজন খুব অসুস্থ রোগী। রোগীকে কেউ পরামর্শ দিল, ঐ ডাক্তারের কাছে যাও এবং নিজের চিকিৎসা করাও। রোগী উত্তরে বলল, তাঁর মত বড় ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা করানো তো অত্যন্ত সুস্থ-সবল লোকদের কাজ, আমার মত ভীষণ অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব?

এই রোগী মূলত আহমক এবং ঐ ডাক্তারের ডাক্তারি যোগ্যতাকে অস্বীকারকারী। কারণ ডাক্তারের কাজই তো অসুস্থদের চিকিৎসা করা। আর যে ব্যক্তি কেবল সুস্থদের চিকিৎসা করে এবং তার ঔষধে কেবল সুস্থদেরই ফায়দা হয়, অসুস্থদের কোন ফায়দা হয় না—সে আবার কিসের ডাক্তার?

মোটকথা, যে বেশি মূর্খ, কুরআন-হাদীসের কথা বোঝার জন্য তার বেশি আগ্রহ থাকা উচিত। আর যে বেশি গুনাহগার, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে চলার ক্ষেত্রে তার আরো বেশি সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সুতরাং আম-খাস নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য কুরআন-হাদীস অন্বেষণ করা, তা বোঝার চেষ্টা করা, তার উপর পরিচালিত হওয়া এবং সে অনুযায়ী নিজের ঈমানকে সহীহ করা।

ঘ. ঈমানের দুটি অংশ

ঈমানের দুটি অংশ। আল্লাহকে আল্লাহ হিসেবে মেনে নেওয়া এবং রাসূলকে রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।

আল্লাহকে আল্লাহ হিসেবে মেনে নেওয়া হয় এভাবে যে, কাউকে তাঁর শরীক মনে করবে না। আর রাসূলকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করা হয় এভাবে যে, তিনি ছাড়া আর কারও পথ অনুসরণ করবে না।

প্রথমটিকে তাওহীদ বলে এবং এর বিপরীতটিকে শিরক বলে। আর দ্বিতীয়টিকে ইত্তিবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতের অনুসরণ বলে এবং এর বিপরীতকে বিদআত বলে।

সুতরাং প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, তাওহীদ ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং শিরক ও বিদআত থেকে সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা। শিরক ও বিদআত—এদুটি জিনিস ঈমানকে ত্রুটিযুক্ত করে আর অন্য সকল গুনাহ আমলকে ত্রুটিযুক্ত করে।

ঙ. অনুসৃত হবার উপযুক্ত কে?

সাথে সাথে এটাও খেয়াল রাখা উচিত যে, যিনি তাওহীদ ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের ক্ষেত্রে কামেল হবেন, শিরক-বিদআত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবেন এবং তার সোহবতে মানুষের মধ্যেও এসব গুণ অর্জিত হবে— এমন ব্যক্তিকেই নিজের শাইখ ও উস্তাদ নির্বাচন করবে।

চ. কিতাবের বিষয়বস্তু ও বিন্যাস

উক্ত উদ্দেশ্যে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় সাবলীল অনুবাদ ও ভাবার্থসহ কিছু আয়াত-হাদীস সংকলিত করেছি, যেগুলোর মধ্যে তাওহীদ ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের বর্ণনা এসেছে এবং শিরক-বিদআতের নিন্দা করা হয়েছে। যেন আম-খাস সকলেই সমানভাবে উপকৃত হতে পারে এবং আল্লাহর তাওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরল পথে চলতে পারে। আর লেখকের জন্য যেন নাজাতের উসিলা হয়ে যায়। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সবচেয়ে বড় গুনাহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন–

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

'এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল– হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? আল্লাহর রাসূল উত্তরে বললেন– আল্লাহর কোনও সমকক্ষ বা শরীক সাব্যস্ত করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (এটা সবচেয়ে বড় গুনাহ)'।

–সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮৬১, ৭৫৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৬;
মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৬১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শিরক ও অজ্ঞতার ভয়াবহ বিস্তার

শিরক মানুষের মাঝে ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে এবং তাওহীদ ধীরে ধীরে অনুপস্থিত হতে চলেছে। অধিকাংশ মানুষ তাওহীদ ও শিরকের অর্থই জানে না। ঈমানের দাবি করে থাকে অথচ সে শিরকে লিপ্ত। তাই প্রথমেই তাওহীদ ও শিরকের অর্থ বোঝা দরকার, যেন কুরআন-হাদীস থেকে এগুলোর প্রশংসা ও নিন্দা বুঝতে সহজ হয়।

শিরকের বিভিন্ন রূপ ও ধরন

অধিকাংশ লোক বিপদাপদের সময় পীর, নবী-রাসূল, ইমাম[১২], শহীদ, ফেরেশতা ও জীন-পরিদের ডাকে এবং তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পুরণের আবদার জানায়। তাদের জন্য মান্নত মানে এবং প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তাদের নামে নযর-মান্নত পেশ করে। বালা-মুসিবত দূর করার জন্যে নিজের সন্তানদেরকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করে থাকে।

সুতরাং কেউ নিজের ছেলেন নাম রাখে 'আব্দুন নবী', কেউ রাখে 'আলী বখশ', কেউ 'হুসাইন বখশ', কেউ 'পীর বখশ', কেউ 'মুদার

---

[১২] উদ্দেশ্য আহলে বাইত ইমামগণ, যাদের ব্যাপারে শিয়ারা অনেক বাড়াবাড়ি করেছে এবং তাদেরকে মর্যাদা ও পবিত্রতার চন্দ্র-বলয় দ্বারা পরিবেষ্টন করে দিয়েছে। তাদের ব্যাপারে মাসূম ও আলিমুল গাইব হওয়ার বিশ্বাস রাখে। ইমাম হওয়ার তারা এমন ব্যাখ্যা করে যা ইমামদেরকে নবুওয়াতের অংশীদার বানিয়ে দেয়। বরং অনেক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাদেরকে নবীদের প্রতিদ্বন্দ্বীও সাব্যস্ত করে! হিন্দুস্তানে শিয়া শাসকবর্গের প্রভাবে এবং শিয়াদের সাথে মেলামেশা ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন সুন্নীরাও অনেক শিয়া আকীদায় আক্রান্ত হয়েছে। –নদভী

বখশ’[১৩], কেউ ‘সালার বখশ’[১৪], কেউ গোলামে মুহিউদ্দীন’, আবার কেউ ‘গোলামে মুঈনুদ্দীন’[১৫] নাম রাখে।

---

১৩. উদ্দেশ্য হলো, প্রসিদ্ধ বুযুর্গ বদীউদ্দীন মুদার হালাবী মাকিনপুরী রহ., যিনি হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ আল্লাহওয়ালাদের একজন। লোকেরা তার প্রতি সম্বন্ধ করে এমন সব আজগুবি কিচ্ছা-কাহিনী বলে থাকে যেগুলো আকল ও নকল (কুরআন-হাদীস), উভয় দৃষ্টিতেই আপত্তিকর। হিন্দুস্তানের অনেক এলাকায় জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত ক্যালেন্ডারের একটি মাসের নাম তার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে ‘মুদার’ রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে তার নাম প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তিনিই মুদারিয়্যাহ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা, যা শেষের দিকে এসে বিচ্যুতির শিকার হয়েছে এবং তাতে অনেক কুসংস্কার ও বাহলুওয়ানী সাধনা যুক্ত হয়েছে। তিনি ১০ জুমাদাল উলা ৮৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। –নদভী (তার জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য : নুযহাতুল খাওয়াতির, ৩/২৩৮। –অনুবাদক)

১৪. উদ্দেশ্য হলো হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব সাইয়্যেদ সালার মাসউদ গাজী। তাকে কেন্দ্র করে অনেক কিচ্ছা-কাহিনী রচিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার ব্যক্তিসত্তার উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করা হয়নি। বিশ্ব পর্যটক ইবনে বাতুতা তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি তার অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা জয় করেছেন। তার ব্যাপারে অনেক আজগুবি ঘটনা এবং যুদ্ধের কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ৫৮৮ হিজরীতে শহীদ হন এবং হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশের বাহরায়েচ শহরে তাকে দাফন করা হয়। নুযহাতুল খাওয়াতিরে লিখেছেন- হিন্দুস্তানী শাসকবর্গ তার কবরের উপর শানদার ইমারাত নির্মাণ করেছেন এবং লোকজন অনেক দূর-দূরান্ত থেকে তার কবর যিয়ারত করতে আসে। আগন্তুকরা মনে করে– তিনি অবিবাহিত যুবক ছিলেন, তাই তারা প্রতি বছর তাকে বিয়ে দেয় এবং বিয়ে উপলক্ষ্যে বিরাট আয়োজন করে থাকে। তার জন্য অনেক পতাকা মান্নত করে, যেগুলো তার মাজারে লাগানো হয়। –নদভী (দেখুন : নুযহাতুল খাওয়াতির, ১/৮০। –অনুবাদক)

১৫. বখশ মানে দান। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুকের দান। আলী দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রাযি.। হুসাইন দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযি.। মুদার এবং সালার হলো হিন্দুস্তানী দুজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গের নাম। গোলাম মানে বান্দা। মুহিউদ্দীন হলেন প্রসিদ্ধ ইমাম শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী। মুঈনুদ্দীন হলেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী, যিনি হিন্দুস্তানে চিশতিয়্যাহ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। এই উপমহাদেশে ইসালামের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ৬ রজব ৬২৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে উল্লিখিত নামগুলো গলদ এবং এগুলো আউলিয়াদের ব্যাপারে ‘কাদের’ (সর্বক্ষম) ও দাতা হওয়ার বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। –নদভী

সন্তানদের জীবন বিপদমুক্ত রাখতে কেউ কেউ কোনও ওলীর নামে মাথায় ঝুঁটি (টিকি) রাখে। কেউ পীরের নামে সন্তানের গলায় মালা বা কাপড় পরায়। কেউ কেউ আবার পীর-মাশায়েখের নামে পায়ে বেড়ি পরায়। কতক লোক তাঁদের নামে প্রাণী জবাই করে এবং বিপদাপদে তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আর কেউ কেউ কথাবার্তায় তাঁদের নামে কসম খায়।

অজ্ঞ মুসলিম সমাজ কর্তৃক পূর্ববর্তী মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ

মোটকথা হিন্দুরা তাদের প্রতিমার সাথে যা যা করে, এসব নামধারী মুসলমানরা তার সবকিছুই নবী-ওলী, ইমাম-শহীদ, ফেরেশতা এবং জিন-পরিদের সাথে করে থাকে। আর দাবি করে তারা মুসলমান! কোথায় দাবি আর কোথায় বাস্তবতা! আল্লাহ তাআলা সূরা ইউসুফে সত্যই বলেছেন-

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

‘তাদের মধ্যে অধিকংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে’।[১৬]

অর্থাৎ ঈমানের দাবিদার অধিকাংশ লোকই শিরকে লিপ্ত। এখন যদি কেউ তাদেরকে বলে, একদিকে তোমরা ঈমানের দাবি কর, অপরদিকে শিরকি কাজেও লিপ্ত হও- তো বিপরীতমুখী দুটি জিনিস কীভাবে একত্র হবে?

তখন তারা উত্তর দেয়, আমরা তো কোনও শিরক করি না! আমরা তো কেবল নবী-ওলীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করি। শিরক তো তখনই হবে, যখন আমরা এসকল নবী-ওলী ও পীর-শহীদদেরকে আল্লাহর বরাবর মনে করব, অথচ আমরা তো এমনকিছু মনে করি না!

বরং আমরাও তাদেরকে আল্লাহর বান্দা ও মাখলুক মনে করি। এই স্বাধীন কর্মক্ষমতা আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে দান করেছেন! তাঁর

---

[১৬] সূরা ইউসুফ, ১০৬

ইচ্ছারই তারা দুনিয়াতে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তাদেরকে ডাকা ও তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা খোদ আল্লাহ তাআলাকে ডাকা ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনারই নামান্তর!

তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, আল্লাহর নিকট তাদের একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। ফলে তারা যা চান করতে পারেন! তারা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী ও উকিল। তাদেরকে পেলে আল্লাহকে পাওয়া যায়। তাদেরকে ডাকলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়। আমরা যতই তাদের মারেফত (পরিচয়) লাভ করি ততই আমরা আল্লাহর নৈকট্যশীল হই! এজাতীয় আরো অনেক প্রলাপোক্তি করতে থাকে।

এসবের কারণ হলো, কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে নিজের মস্তিষ্ককে অনধিকার চর্চার সুযোগ দিয়েছে, মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনীর পিছনে ছুটেছে এবং বিভিন্ন গলদ প্রথাকে দলীল বানিয়েছে।

যদি তারা কুরআন-হাদীস অন্বেষণ করত তাহলে বুঝতে পারত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কাফেররা একই ধরনের যুক্তি পেশ করত! কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এসব যুক্তির একটিও গ্রহণ করেননি বরং তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন।

সূরা ইউনুসে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ
شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ ؕ
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ⑱

'তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যারা তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করছ, যার কোনও অস্তিত্ব তাঁর জ্ঞানে নেই, না আসমানে এবং না পৃথিবীতে? বস্তুত তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে'।[১৭]

---

[১৭] সূরা ইউনুস, ১৮

অর্থাৎ মানুষ যাদেরকে ডাকে আল্লাহ তাআলা তাদের কোনও ক্ষমতাই দেননি, না উপকার করার আর না ক্ষতি করার। আর লোকেরা যে বলে, তারা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী- তো এ ক্ষেত্রে কথা হলো আল্লাহ তাআলা তো এমন কিছু বলেননি; তাহলে কি তোমরা আল্লাহ তাআলার চেয়েও বেশি জান এবং তিনি যা জানেন না তা তাঁকে জানাতে এসেছ?!

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, আসমান-জমিনে এমন কোনও সুপারিশকারী নেই যাকে মানলে বা না-মানলে কোনও উপকার বা ক্ষতি হবে। আর নবী-ওলীদের যে সুপারিশের কথা আছে, সেটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। তাদেরকে ডাকা বা না-ডাকার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। সাথে এটাও জানা গেল যে, কাউকে সুপারিশকারী মনে করে ইবাদত করলেও মুশরিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা সূরা যুমারে ইরশাদ করেন-

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ۬ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣

'যারা তাঁকে ছাড়া অন্যসব অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে (এই কথা বলে যে,) আমরা তাদের উপাসনা করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে, আল্লাহ তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন যার মাঝে তারা মতবিরোধ করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোনও ব্যক্তিকে পথে আনেন না, যে চরম মিথ্যুক, ঘোর কাফের'।[১৮]

অর্থাৎ বাস্তবতা ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। কিন্তু তারা এ বাস্তবতা ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং অন্যদের সহযোগী সাব্যস্ত করেছে। এটা তো আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ছিল যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে কোনও মাধ্যম ছাড়াই

---

১৮. সূরা যুমার, ৩

প্রকাশ করেছেন, অথচ তারা নবী-ওলীদের সাথে এরূপ আচরণ করত; মূর্তিপূজা করত না।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা তাওবাতে ইরশাদ করেন-

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ ۚ

وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِیَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝٣١

'তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবার (অর্থাৎ ইহুদী ধর্মগুরু) এবং রাহিব (খ্রিষ্টান বৈরাগী)-কে খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসীহ্ ইবনে মারয়ামকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করার হুকুম দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত কোনও মাবুদ নেই। তাদের অংশীবাদীসুলভ কথাবার্তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র'।[২০]

অর্থাৎ তারা আল্লাহকে বড় মালিক মনে করে। আর মৌলভী-দরবেশদেরকে তাঁর চেয়ে ছোট মালিক মনে করে, অথচ এর নির্দেশ ও অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি। এর মাধ্যমে তাদের উপর শিরক সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি তো অদ্বিতীয়, কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না, না ছোট আর না সমকক্ষ! বরং ছোট-বড় সকলেই তাঁর অক্ষম বান্দা, অক্ষমতায় তারা সবাই বরাবর।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা মারয়ামে বলেন-

اِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِی الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝٩٣ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ

وَ عَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤ وَ كُلُّهُمْ اٰتِیْهِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فَرْدًا ۝٩٥

'আসমানে ও জমিনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের দরবারে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। নিশ্চয়ই তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে গুণে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে'।[২১]

অর্থাৎ কোনও মানুষ বা ফেরেশতার স্তর (মর্যাদা) গোলামীর চেয়ে বেশি কিছু না, সকলে আল্লাহর সামনে অক্ষম; কোনও ক্ষমতা নেই।

---

২০. সূরা তাওবা, ৩১

২১. সূরা মারয়াম, ৯৩-৯৫

প্রত্যেকের উপর আল্লাহ তাআলাই কর্তৃত্ব করেন। একজনকে আরেকজনের কর্তৃত্বে অর্পণ করেন না। প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে একাকী তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। কেউ কারও উকিল বা সাহায্যকারী হবে না।

পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। কেউ যদি উপরে উল্লিখিত আয়াতগুলোর অর্থও ভালোভাবে আত্মস্থ করে নেয়, তবে সেটাও তাওহীদ ও শিরকের ব্যাপারে হুঁশিয়ার হবার জন্যে যথেষ্ট।

এখন দেখতে হবে, আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন জিনিসকে নিজের সাথে খাস করেছেন, যেগুলোতে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না?

সেগুলো আসলে অনেক। তবে কয়েকটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখ করে কুরআন-হাদীস থেকে তা প্রমাণ করে দেওয়া জরুরি মনে করছি। আর অবশিষ্টগুলো মানুষ তা থেকেই বুঝে নেবে।

১. সর্বব্যাপী জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ

প্রথম বিষয় হলো, সর্বত্র হাজির-নাযির হওয়া, প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি বস্তুর খবর রাখা- দূরে হোক বা কাছে, গুপ্ত হোক বা উন্মুক্ত, আঁধারে হোক কিংবা আলোয়, আকাশে হোক বা পাতালে, অথবা পাহড়ের চূড়ায় কিংবা সমুদ্রের তলদেশে- এটা কেবল আল্লাহ তাআলারই শান, অন্য কারও নয়!

সুতরাং কেউ যদি উঠতে-বসতে কারও নাম জপে, কাছে বা দূরে থেকে তাকে ডাকে, বালা-মুসিবতে তার দোহাই দেয়, তার নাম নিয়ে শত্রুদের উপর আক্রমণ করে, তার নামের খতম পড়ে কিংবা তার ধ্যান করে এবং মনে করে যে, মুখে বা অন্তরে যখনই তার নাম স্মরণ করি, অথবা তার সূরত বা কবরের ধ্যান করি তখনই সে বুঝতে পারে এবং আমার কোনও বিষয় তার কাছে গোপন থাকে না। আমি যত ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হই, যেমন– সুস্থতা-অসুস্থতা; প্রাচুর্য বা দারিদ্র্য; সুখ-দুঃখ এবং বাঁচা-মরা সবকিছুই সে জানে এবং আমার মুখ থেকে যে কথাই বের হয়, তা সে শুনতে পায়। এমনকি আমার মনে

যেসব জল্পনা উঁকি দেয় সেসব সম্পর্কেও সে অবগত– এসব বিশ্বাসের মাধ্যমে সে মুশরিক হয়ে যাবে। এ ধরনের ধ্যানধারণা সবই শিরক।

এটাকে 'ইশরাক ফিল্ইলম' (ইলমের ক্ষেত্রে শিরক) বলে। অর্থাৎ আল্লাহর মত অন্য কারও জন্য ইলম সাব্যস্ত করা। এমন বিশ্বাস রাখার দ্বারা মানুষ অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে, চাই তা নবী-ওলীদের ব্যাপারে হোক কিংবা পীর-শহীদদের ব্যাপারে; আর চাই ইমাম ও ইমামদের সন্তানদের ব্যাপারে হোক বা ভূত-পরীদের ব্যাপারে! অনুরূপভাবে সে এই সর্বময় জ্ঞানকে ঐ ব্যক্তির সত্তাগত মনে করুক কিংবা আল্লাহপ্রদত্ত মনে করুক! মোটকথা সর্বাবস্থায়ই এই বিশ্বাস দ্বারা শিরক সাব্যস্ত হবে।

২. নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং কামেল কুদরত আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ

দ্বিতীয় বিষয় হলো, বিশ্বজগতে স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করা; নিজের হুকুম জারি করা; আপন মর্জি অনুযায়ী কাউকে মৃত্যু দান করা বা জ্বালিয়ে দেওয়া; রিযিকে প্রশস্ততা কিংবা সংকীর্ণতা আরোপ করা; সুস্থতা-অসুস্থতা দান করা; বিজয়ী বা পরাজিত করা; উন্নতি বা অবনতি প্রদান করা; কামনা-বাসনা এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা; বালা-মুসিবত দূর করা এবং বিপদাপদে সাহায্য করা—এসব একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাজ; তাঁরই বৈশিষ্ট্য। এসব কোনও নবী-ওলী, পীর-শহীদ কিংবা ভূত-পরীর কাজ নয়।

অতএব কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য এমন ক্ষমতা সাব্যস্ত করে- তার কাছে নিজের মনোবাঞ্ছা কামনা করে, তার নামে মানত মানে ও প্রাণী উৎসর্গ করে এবং বিপদাপদে তাকে ডাকে, তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে।

এটাকে 'ইশরাক ফিততাসারুরুফ' বলে। অর্থাৎ অন্য কারও জন্য আল্লাহর মত কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করা স্পষ্ট শিরক। চাই এই কর্তৃত্বকে তার সত্তাগত মনে করুক কিংবা আল্লাহপ্রদত্ত মনে করুক- সর্বাবস্থায়ই শিরক!

৩. ইবাদত সংক্রান্ত আমল ও নিদর্শনসমূহ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য

তৃতীয় বিষয় হলো, সম্মানসূচক কিছু কাজ এমন রয়েছে যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য খাস করেছেন। এসব কাজকে ইবাদত বলে।

যেমন- রুকু করা; সেজদা করা; হাত বেঁধে দাঁড়ানো; তাঁর নামে দান করা; তাঁর নামে রোযা রাখা; তাঁর ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূরদূরান্ত থেকে সফর করা এবং এমন বেশভূষা এখতিয়ার করা, যার দ্বারা যে-কেউ বুঝতে পারে যে, সে ঐ ঘরের যিয়ারতে যাচ্ছে; রাস্তায় তাঁর নাম ডাকতে থাকা; অনর্থক কথাবার্তা ও পশুশিকার থেকে বিরত থাকা; এ অবস্থায় গমন করে তওয়াফ করা এবং ঐ গৃহ অভিমুখে সেজদা করা; সেখানে যবাহ করার পশু নিয়ে যাওয়া; সেখানে মানত করা; ঐ ঘরে গেলাফ লাগানো; তার চৌকাঠ ধরে দুআ করা ও দ্বীন-দুনিয়ার সব প্রয়োজন প্রার্থনা করা; একটি পাথরে চুমু খাওয়া; ঐ গৃহের দেয়ালে বুক ও গাল লাগানো এবং তার গেলাফ ধরে দুআ করা; তার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করা এবং প্রতিবেশী হয়ে তার খেদমতে আত্মনিয়োগ করা, যেমন- ঝাড়ু দেওয়া, বাতি জ্বালানো, বিছানা বিছানো, পানি পান করানো, লোকদের উযু-গোসলের ব্যবস্থা করা; বরকত মনে করে এর কূপের পানি পান করা, নিজের শরীরে ঢালা, পরস্পর বণ্টন করে নেওয়া এবং অনুপস্থিতদের জন্য নিয়ে যাওয়া; বিদায়ের সময় (ঘরের দিকে পিঠ না দিয়ে) উল্টোপায়ে ফিরে আসা; এর আশপাশের জঙ্গলের আদব রক্ষা করা, যেমন- সেখানে কোনো পশু শিকার না করা; গাছ বা ঘাস না কাটা এবং পশু না চরানো—এই সকল কাজ আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইবাদতের জন্য বান্দাদেরকে বাতিয়েছেন।

অতএব কেউ যদি কোনও নবী-ওলী, পীর-বুযুর্গ, ভূত-পরী, সত্য-মিথ্যা কবর, কারও আস্তানা বা মাযার কিংবা কোন নিদর্শনের সাথে এসব কাজ করে, অর্থাৎ রুকু বা সেজদা করে; তাদের নামে রোযা

রাখে[২২] বা প্রাণী উৎসর্গ করে; হাত বেঁধে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে[২৩]; দূরদূরান্ত থেকে এসব মাযারে সফর করে; সেখানে বাতি জ্বালায়; গেলাফ লাগায় বা চাদর পরায়[২৪]; তাদের নামে ঝাণ্ডা গাড়ে; বিদায়ের সময় সেদিকে পিঠ না দিয়ে উল্টোপায়ে ফিরে আসে; তাদের

---

[২২] বোঝা যায়, হিন্দুস্তানে নেককার নারী-পুরুষের নামে রোযা রাখার বিদআতটি পুরাতন আমল থেকেই প্রচলিত আছে। কখনো কখনো তো সম্পূর্ণ কাল্পনিক কোনও ব্যক্তির নামে রোযা রাখা হয়। এসব রোযার নিয়ত ও ইফতারের ক্ষেত্রে রয়েছে অলীক বিশেষ আহকাম এবং আদব। এগুলোর দিনও থাকে নির্দিষ্ট। বুযুর্গদের নামে পালিত এসব রোযার অসীলায় ঐসকল বুযুর্গদের নিকট বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের দুআ করা হয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমাদ সারহিন্দী (১০১৪ হিজরী) রহ. স্বীয় অনুসারী এক নেককার নারীর নিকট প্রেরিত চিঠিতে এসব রোযার সমালোচনা করেছেন এবং এগুলোকে ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক সাব্যস্ত করেছেন। (মাকাতীবে মুজাদ্দিদে আলফে সানী, মাকতূব নং ৩/৪১)। –নদভী

[২৩] যেভাবে অনারব রাষ্ট্রসমূহে রাজকীয় সভায় গোলাম তার মনীবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। –নদভী

[২৪] মৃত ব্যক্তি ও মাযারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সীমালঙ্ঘনকারীরা পীর-বুযুর্গদের মাযারে গেলাফ পরানোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সাথে জীবিত পীর-মাশায়েখদের ন্যায় আচরণ করে থাকে। বর্তমানে এই বিদআত কিছু কিছু আরব দেশেও শুরু হয়েছে। শাইখ আলী মাহফুয তার রচিত আলইবদা' ফী মাযার্রিল ইবতিদা' কিতাবে লেখেন, মাযারে চাদর চড়ানো বিদআত, যা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

সামনে আরো বলেন, মাযারের খাদেমদের জন্য নাপাক রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করতে শয়তান তাদেরকে এই কুমন্ত্রণা দিয়েছে। তাদেরকে দেখবেন, প্রতি বছর যখন মাযারের গেলাফ পাল্টানোর প্রয়োজন হয় বা যখন পুরাতন হয়ে যায় তখন সাধারণ মানুষদেরকে বোঝায় যে, এই গেলাফে এত বরকত রয়েছে যা বর্ণানাতীত। রোগ থেকে আরোগ্য লাভ, হিংসুকদের হিংসা প্রতিহত করা, রিযিকপ্রাপ্তি এবং সব ধরনের বিপদাপদ ও ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য এই গেলাফ খুবই উপকারী। এসব শুনে সাধারণ মানুষ এই পুরাতন গেলাফ নেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং এর কিছুঅংশ লাভের জন্য অনেক সম্পদ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয় না (আলইবদা', পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭)। –নদভী

মাযারে চুমু খায়; এর উপর পাখা ঝুলায়; শামিয়ানা টাঙায়; চৌকাঠে চুমু দেয়; হাত জোড় করে আশ্রয় চায়, সাহায্য প্রার্থনা করে; খাদেম হিসেবে সেখানে থেকে যায়; মাযারের আশপাশের জঙ্গলের প্রতি বিশেষ আদব প্রদর্শন করে। এসব কাজ কেউ করলে সেটা তার জন্য শিরক সাব্যস্ত হয়ে যায়।

এটাকে ইবাদতের শিরক বলে। অর্থাৎ আল্লাহর মতো অন্য কারও তাযীম বা সম্মান করা। চাই তা এ মনে করে করুক যে, তিনিই একমাত্র এই সম্মানের উপযুক্ত কিংবা মনে করে যে, তার এরূপ সম্মান দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশি হন এবং তাকে তাযীম করার বরকতে আল্লাহ তাআলা বালা-মুসিবত দূর করে দেন। সর্বাবস্থায়ই শিরক সাব্যস্ত হবে!

৪. দাসত্ব ও নতিস্বীকারনির্দেশক তাযীমসমূহ আল্লাহর সাথে খাস

চতুর্থ বিষয়, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের শিখিয়েছেন– দুনিয়াবী কাজ-কর্মে আল্লাহকে স্মরণ রাখবে এবং তাঁর প্রতি তাযীম প্রকাশ করবে। এতে ঈমান ঠিক থাকবে এবং কাজে বরকত হবে।

যেমন– কঠিন কাজে আল্লাহর জন্য মানত করা; বিপদাপদে তাঁকে ডাকা; তাঁর নামে প্রতিটি কাজ শুরু করা; সন্তান জন্ম নিলে তাঁর শোকর আদায়ের লক্ষ্যে পশু জবাই করা এবং তার নাম 'আবদুর রহমান', 'আবদুল্লাহ', 'আতাউল্লাহ', 'খোদাবখশ' (হেবাতুল্লাহ), কন্যা হলে 'আমাতুল্লাহ' বা 'আতিয়্যাতুল্লাহ'[২৫] ইত্যাদি রাখা।

অনুরূপভাবে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফলফলাদির কিছু অংশ তাঁর নামে রেখে দেওয়া; সম্পদ ও পশু-পালের কিছু অংশ তাঁর নামে

---

[২৫] এখানে গ্রন্থকার তাওহীদ ও সহীহ আকীদা থেকে উৎসারিত কিছু হিন্দুস্তানী নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন– 'খোদাবখশ' ও 'আল্লাহ দিয়া' মানে আল্লাহপ্রদত্ত বা আল্লাহর দান (আরবীতে হেবাতুল্লাহ বা আতাউল্লাহ), কন্যা হলে 'আল্লাহদী' মানে আল্লাহপ্রদত্ত (আরবীতে আতিয়্যাতুল্লাহ)। পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা নামগুলোকে আরবীতে রূপান্তরিত করে দিয়েছি। –নদভী

উৎসর্গ করা; তাঁর নামে যে পশুকে তাঁর ঘরাভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় তার বিশেষ আদব রক্ষা করা, অর্থাৎ তার উপর আরোহণ বা বোঝা বহন না করা; পানাহারের ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম অনুসরণ করা, অর্থাৎ যেগুলোর আদেশ করেছেন সেগুলো করা এবং যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা; দুনিয়াতে যত কল্যাণ-অকল্যাণ আছে, যেমন- সুস্থতা-অসুস্থতা, প্রাচুর্য ও দুর্ভিক্ষ, জয়-পরাজয়, উন্নতি-অবনতি, আনন্দ-বেদনা- এ সবকিছুকে তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত মনে করা।

নিজের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করতে হলে প্রথমে তাঁর ইচ্ছার কথা উল্লেখ করা, যেমন- ইনশাআল্লাহ বা আল্লাহ চাইলে আমরা অমুক কাজটি করব; তাঁর নাম এমন ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে নেওয়া, যেন তা থেকে তাঁর প্রভুত্ব ও নিজের গোলামীর অবস্থা প্রকাশ পায়, যেমন এভাবে বলা যে- আমাদের রব, আমাদের মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা; যখন কথাবার্তায় কসম খাওয়ার প্রয়োজন হবে তখন তাঁরই নামে কসম খাওয়া ইত্যাদি।

এসব জিনিস আল্লাহ তাআলা স্বীয় তাযীমের জন্য বাতলিয়েছেন।

সুতরাং কেউ যদি কোনও নবী-ওলী, ইমাম-শহীদ বা ভূত-পরীদের প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, যেমন- কঠিন কাজে তাদের নামে মানত করে; বিপদাপদে তাদেরকে ডাকে; বিসমিল্লাহর জায়গায় তাদের নামে কাজ শুরু করে; সন্তান হলে তাদের নামে প্রাণী উৎসর্গ করে; সন্তানের নাম 'আবদুন নবী', 'ইমামবখশ' বা 'পীরবখশ' রাখে; ফসল ও বাগানে তাদের নামে অংশ বরাদ্দ দেয়; ফল-ফসল ঘরে আসলে প্রথমে তাদের নামে উৎসর্গ করে অতঃপর নিজেরা ব্যবহার করে; সম্পদ ও পশু-পাল থেকে কিছু তাদের নামে বরাদ্দ করে সেগুলোর সাথে বিশেষ আদব রক্ষা করে, যেমন- দানা-পানি থেকে কখনো বারণ করে না এবং লাকড়ি বা পাথর দ্বারা কখনো আঘাত করে না।

অনুরূপভাবে পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রসম-রেওয়াজকে আঁকড়ে থাকে, যেমন- অমুক খাবার বা পোশাক অমুক

শ্রেণির লোকদের জন্য নিষিদ্ধ; বীবী ফাতেমার নামে পাকানো খাবার[২৬]—পুরুষ, দাসী ও দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ নারীদের জন্য নিষিদ্ধ; শাহ আবদুল হকের[২৭] নামে পাকানো খাবার—হুক্কাখোরদের জন্য নিষিদ্ধ প্রভৃতি। দুনিয়াতে যে ভালো-মন্দ ঘটে সেগুলোকে এসব পীর-মাশায়েখদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে এবং বলে থাকে, অমুকের উপর অমুক পীর সাহেবের অভিশাপ লেগেছে বিধায় পাগল হয়ে গেছে, কিংবা অমুক বুযুর্গ তাড়িয়ে দেওয়ার কারণে অমুক ব্যক্তি গরিব হয়ে গেছে আর অমুককে দান করার ফলে তার উন্নতি-অগ্রগতির রাস্তা খুলে গেছে; অমুক তারকার কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে; অমুক কাজটি অমুক দিন বা অমুক মুহূর্তে শুরু করার কারণে পূর্ণ হলো না।

আরও বলে থাকে– আল্লাহ ও তাঁর রাসূল চাইলে আমি আসব, পীর সাহেব চাইলে কাজটি হয়ে যাবে অথবা পীর-মাশায়েখদের ব্যাপারে বলে– 'হে মাবূদ', 'দাতা', 'খোদাদের খোদা', 'রাজত্বের অধিকারী', 'শাহেনশাহ'!; কসম খাওয়ার সময় নবী, আলী রাযি., ইমাম, পীর বা তাদের কবরের কসম খায় ইত্যাদি। এই সকল জিনিস দ্বারা শিরক সাব্যস্ত হয়।

---

[২৬] এটা এক ধরনের খাবার যা হিন্দুস্তানে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর নামে পাকানো হয়। এই খাবার কেবল নারীদের জন্য। পুরুষরা এটা খেতে পারে না এবং এর কাছেও যেতে পারে না। –নদভী

[২৭] এ দ্বারা উদ্দেশ্য– হিন্দুস্তানের চিশতিয়্যাহ তরীকার ইমাম ও বড় শাইখ হযরত আবদুল হক রুদুলভী রহ.। তিনি উধের অন্তর্গত রুদুলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাওহীদের হেফাজত, শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধা, ফরয ও সুন্নতের পাবন্দী, মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত এবং (আল্লাহর ধ্যানে) একাকিত্ব অবলম্বনের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল অনেক উঁচু। তিনি ৮৩৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (তাঁর জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য- নুযহাতুন খাওয়াতির, ৩/২২৯- অনুবাদক) হিন্দুস্তানের মূর্খ ও সীমালঙ্ঘনকারীরা তাঁর নামে এক বিশেষ খাবার আবিষ্কার করেছে, যার নাম দিয়েছে 'শাহ আবদুল হকের তোশা বা পাথেয়'। এটা ময়দা ও চিনি দিয়ে বানানো হয়। এর বেশকিছু আদব ও নিয়মনীতি আছে, যেগুলো অত্যন্ত কঠোরতার সাথে রক্ষা করা হয়। –নদভী

এগুলোকে শিরক ফিল 'আদাত বা অভ্যাসগত শিরক বলে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসগত কাজ-কর্মে আল্লাহ তাআলার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করার কথা, অনুরূপ সম্মান অন্যের জন্য করা।

এই চারো প্রকারের শিরকের সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন-হাদীসে এসেছে। এ জন্য সামনের অধ্যায়কে পাঁচটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিরকের নিন্দা ও তাওহীদের প্রশংসা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইলমের ক্ষেত্রে শরীক স্থাপনের নিন্দা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক করার নিন্দা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক করার নিন্দা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অভ্যাসগত কাজ-কর্মে শিরক করার নিন্দা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিরকের ভয়াবহতা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচের যে-কোনও গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, সে (সঠিক পথ থেকে) বহু দূরে সরে যায়'।[২৮]

শিরক ও অন্যান্য গুনাহের মাঝে মৌলিক পার্থক্য

অর্থাৎ মানুষ আল্লাহকে ভুলে অনেক গুনাহই করে থাকে। যেমন– হালাল-হারামের মাঝে ভেদাভেদ না করা, চুরি বা অন্য কোন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া, নামায-রোযা ছেড়ে দেওয়া, পরিবার-পরিজনের হক নষ্ট করা, মা-বাবার সাথে বেয়াদবি করা ইত্যাদি। কিন্তু যে শিরকে লিপ্ত হয় সে সবচেয়ে বড় পাপী। কারণ সে এমন পাপে লিপ্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তা কখনোই ক্ষমা করবেন না। অন্য সব গুনাহ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, শিরকের গুনাহ মাফ করা হবে না। এর যে নির্ধারিত শাস্তি আছে তা ভোগ করতেই হবে।[২৯]

---

[২৮] সূরা নিসা, ১১৬

[২৯] শিরকের গুনাহ মাফ করা হবে না–এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি তাওবা না করে মারা যায়, তাহলে শিরকের গুনাহ মাফ করা হবে না। কিন্তু যদি মৃত্যুর পূর্বে যথাযথ পন্থায় শিরক থেকে তাওবা করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই মাফ করে দেওয়া হবে। –অনুবাদক

প্রকাশ্য শিরক খোদাদ্রোহিতার শামিল, যা আল্লাহর আত্মসম্মানবোধকে নাড়া দেয়

অতঃপর শিরক যদি চূড়ান্ত পর্যায়ের হয়, যা দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যায় তাহলে তার শাস্তি হলো, সে চিরকাল দোযখে থাকবে– কখনো বের হতে পারবে না। আর যদি এরচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয় তাহলে তার জন্য আল্লাহর নিকট নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করবে। এছাড়া অন্যান্য যেসব গুনাহ আছে, সেগুলোর যে শাস্তি আল্লাহর নিকট নির্ধারিত রয়েছে সেক্ষেত্রে আল্লাহর মর্জি– চাইলে শাস্তি দেবেন আর চাইলে মাফ করে দেবেন। সুতরাং বোঝা গেল যে, শিরক থেকে বড় কোনও গুনাহ নেই।

এর উদাহরণ হলো, প্রজারা বাদশার রাজত্বে বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধ করে থাকে। যেমন– চুরি-ডাকাতি করা; চৌকি পাহারার সময় ঘুমিয়ে যাওয়া; রাজকীয় সভার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হওয়া; যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া; সরাকারি অর্থ পৌঁছাতে অবহেলা করা ইত্যাদি। বাদশার নিকট এই সকল অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। তবে তিনি চাইলে পাকড়াও করেন আর চাইলে ক্ষমা করে দেন।

এগুলোর বিপরীতে আরেকটি অপরাধ হলো এমন যা দ্বারা বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। যেমন– কোন গভর্নর-মন্ত্রী-আঞ্চলিক নেতা বা কোন চামারের হাতে আনুগত্যের শপথ করে তাকে বাদশা ঘোষণা করে, তার জন্য সিংহাসন ও মুকুট তৈরি করে, তার সাথে রাজকীয় উপাধি ব্যবহার করে, তার জন্য রাজকীয় অনুষ্ঠান ঘোষণা করে[৩০] এবং তাকে

---

[৩০] হিন্দুস্তানী রাজা-বাদশারা নির্দিষ্ট কিছু দিনে অনুষ্ঠান পালন করত। এসব দিনে বাদশা ফকির-মিসকীনদেরকে দান-খয়রাত করত। এই দিনগুলোর মধ্যে একদিন সিংহাসনে বসত এবং স্বর্ণ-রূপা দ্বারা তাকে পরিমাপ করে সেই স্বর্ণ-রূপা গরিবদের মাঝে বন্টন করা হত! ঐ দিন দ্বারা তারিখ নির্ধারণ করা হত, বলা হত– সিংহাসনে আরোহণের বছর! এজাতীয় অনুষ্ঠান বাদশাহীর প্রতীক ও বড়ত্ব-মহত্ত্বের নিদর্শনে পরিণত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান কেবল সিংহাসন-অধিপতির সাথেই খাস ছিল; কোন প্রজাসাধারণ এতে তার সাথে সম-শরীক হতে পারত না। –নদভী

শাহী উপঢৌকন পেশ করে[৩১]—তো এই অপরাধটি সকল অপরাধ থেকে বড় গণ্য হবে এবং এর নির্ধারিত শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।

আর যে বাদশা এই অপরাধের শাস্তি দিতে অবহেলা করে, বুঝতে হবে তার বাদশাহীর মধ্যেই ত্রুটি আছে। ফলে বুদ্ধিমান লোকেরা এমন বাদশাকে আত্মমর্যাদাহীন বলে।

অতএব বাদশাদের বাদশা সর্বশক্তিমান খোদাকে ভয় করা দরকার, যিনি সর্বাধিক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন। এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি শিরককারীদের ব্যাপারে বেখবর থাকবেন; তাদেরকে শাস্তি দেবেন না!

আল্লাহ সকল মুসলিমদের উপর রহম করুন এবং শিরকের মুসিবত থেকে তাদেরকে হেফাজত করুন!

শিরক চরম জুলুম এবং কোনও বস্তুকে অপাত্রে রাখার শামিল

সূরা লুকমানে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ⑬

'এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম'।[৩২]

---

[৩১] হিন্দুস্তানে মোঘল ও মোঘলদের বাইরে অন্যান্য সম্রাটদেরও রীতি ছিল যে, আমীর, শাহী মহলের ব্যক্তিবর্গ ও প্রজাদের মধ্যে বিশিষ্টজনেরা সম্রাটদেরকে নগদ উপঢৌকন পেশ করত এবং তা ডান হাতের তালুতে রেখে বিশেষ পন্থায় উপস্থাপন করত। অতঃপর সম্রাট তা গ্রহণ করে বা তার উপর কেবল হাত রেখে তাদের নিকট আবার ফিরিয়ে দিত। তখন তারা তা দ্বারা বরকত হাসেল করত এবং নিজেদের জন্য বড় সৌভাগ্য বিবেচনা করত! এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'নযর'। এটাকে রাজত্বের প্রতীক এবং প্রজাদের ভালোবাসা ও সম্মানের নিদর্শন গণ্য করা হত। –নদভী

[৩২] সূরা লুকমান, ১৩

আল্লাহ তাআলা হযরত লুকমানকে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছিলেন। তাই তিনি বুঝেছিলেন, একের হক অপরকে দেওয়া চরম অন্যায়। আর যে আল্লাহর হক তাঁর কোনও মাখলুককে দিল, সে মূলত সবচেয়ে মহান সত্তার হক অতিক্ষুদ্র সত্তাকে দিল। এর উদাহরণ অনেকটা এমন, যেন কেউ বাদশার মুকুট নিয়ে কোন মুচির মাথায় পরিয়ে দিল[৩৩]– তো এরচেয়ে বড় বেইনসাফি এবং অন্যায় আর কী হতে পারে! আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা দরকার, ছোট-বড় সকল মাখলুক আল্লাহর মহত্ত্ব-বড়ত্বের সামনে একজন মুচির চাইতেও ক্ষুদ্র ও অতিতুচ্ছ।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হলো যে, শরীয়ত দ্বারা যেমন এ কথা জানা যায় শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ, তেমনি আকল ও যুক্তি দ্বারাও উপলব্ধি করা যায় শিরক সকল অপরাধের চেয়ে বড় অপরাধ।

---

[৩৩] হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. (মৃ. ৫৬১হিজরী), যাঁর বেলায়াত ও বুযুর্গির ব্যাপারে দল-মত নির্বিশেষে পুরো মুসলিম উম্মাহ একমত, তিনি অত্যন্ত হাকীমানা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং যারা বালা-মুসিবত দূর করার জন্য বা কোনও উপকার লাভের জন্য গাইরুল্লাহর দ্বারস্থ হয়, তাদের নির্বুদ্ধিতাকে সূক্ষ্মভাবে চিত্রায়ণ করেছেন।

তিনি বলেন– সকল মাখলুককে ঐ ব্যক্তির মত মনে কর, বিশাল রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এবং বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী কোনও বাদশা যার হাত বেঁধে গলায় ও পায়ে বেড়ি পরিয়েছে। অতঃপর বিশাল ও সুগভীর ঢেউবিশিষ্ট একটি স্রোতঃস্বিনী নদীর তীরে একটি সিডার বৃক্ষে তাকে শূলে চড়িয়েছে। এরপর বাদশা এমন এক শানদার ও উঁচু সিংহাসনে আরোহণ করেছে যার ধারেকাছে কারও পৌছা সম্ভব না। আর নিজের আশপাশে তীর-বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের এত বিশাল ভাণ্ডার জমা করেছে যার কোনও ইয়ত্তা নেই। তারপর এসব অস্ত্রের মধ্য থেকে যেটা চায় তার দিকে নিক্ষেপ করে– এখন কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর জন্য কি এটা সমীচীন হবে যে, এই বাদশার ভয় ও আশা ত্যাগ করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং ঐ শূলে চড়ানো ব্যক্তিকে ভয় করবে ও তার কাছে আশা করবে?! কেউ এমন করলে সে কি আকলের আদালতে নির্বোধ ও পাগল সাব্যস্ত হবে না? (ফুতুহুল গাইব, ১৭তম মাকালা)। –নদভী

এ জন্যই তো মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় দোষ হলো, বড়দের সাথে বেয়াদবি করা।

- আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

'আমি তোমার পূর্বে এমন কোনও রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া অন্য কোনও মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর'।[৩৪]

অর্থাৎ যত নবী আগমন করেছেন সকলে এই বার্তাই নিয়ে এসেছেন যে, একমাত্র আল্লাহকে মান, অন্য কাউকে মানবে না। এ আয়াত থেকে জানা গেল, শিরক থেকে বাঁচা ও তাওহীদকে আঁকড়ে ধরাই হলো নাজাতের একমাত্র পথ। এছাড়া সবই হলো পথভ্রষ্টতা।

আল্লাহ্ তাআলা কেবল ইখলাসপূর্ণ আমলই কবুল করেন, যেখানে অন্য কারও অংশ নেই

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– শরীকদের মধ্যে আমিই শিরক থেকে সর্বাধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি কোনও আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে তার শিরকসহ প্রত্যাখ্যান করি'।[৩৫]

---

[৩৪] সূরা আম্বিয়া, ২৫

[৩৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪২০২। ইবনে মাজাহর বর্ণনার শব্দ এমন– '...আমি ঐ আমল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; যাকে সে শরীক করেছে আমলটি তার জন্য হবে'। –অনুবাদক

অর্থাৎ যেভাবে অন্যরা নিজেদের যৌথ বস্তুকে পরস্পরের মাঝে বণ্টন করে নেয় আমি তেমন করি না। আমি অমুখাপেক্ষী। সুতরাং কেউ কোনও আমল করে তাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করলে আমি আমার অংশও নেই না। বরং পুরোটাই ত্যাগ করি এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই।

এই হাদীস থেকে জানা গেল, কেউ যদি কোনও কাজ আল্লাহর জন্য করে, অতঃপর সেই কাজই আবার অন্য কারও জন্য করে, তাহলে তার উপর শিরক সাব্যস্ত হয়ে যায়। এটাও জানা গেল, মুশরিক যে ইবাদত আল্লাহর জন্য করে, সেটাও আল্লাহ কবুল করেন না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন!

রূহের জগতে গৃহীত অঙ্গীকার

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত আছে–

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ﴾ الْآيَةَ [الأعراف: ١٧٢]، قَالَ: جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوْا، ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالَ: فَإِنِّيْ أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِيْنَ السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ اٰدَمَ أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا، اِعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلٰهَ غَيْرِيْ، وَلَا رَبَّ غَيْرِيْ، فَلَا تُشْرِكُوْا بِيْ شَيْئًا، وَإِنِّيْ سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِيْ، يُذَكِّرُوْنَكُمْ عَهْدِيْ وَمِيْثَاقِيْ، وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِيْ، قَالُوْا: شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلٰهُنَا، لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ، وَلَا إِلٰهَ لَنَا غَيْرُكَ.

‘সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উবাই ইবনে কা‘ব রাযি. বলেন, আল্লাহ তাআলা বনী আদমকে একত্র করে তাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর বাকশক্তি দিয়েছেন। তখন তারা কথা বলেছে। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং তাদের নিজেদেরকেই

নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন– আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন তারা এক বাক্যে উত্তর দিয়েছে– অবশ্যই, আপনিই আমাদের প্রভু! আল্লাহ বললেন– আমি তোমাদের উপর সাত আসমান ও সাত জমিন এবং তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী রাখছি, যেন কিয়ামাতের দিন বলতে না পার যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।

সুতরাং জেনে রাখ! আমি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই; আমি ছাড়া কোনও প্রতিপালক নেই; আমার সাথে কাউকে শরীক করো না! অতিসত্বর আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলদের পাঠাব, যারা তোমাদেরকে তোমাদের এই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেবে এবং তোমাদের নিকট আমার কিতাবসমূহ নাযিল করব! তারা বলল– আমরা সাক্ষ্য দিলাম, আপনিই আমাদের প্রভু ও উপাস্য! আপনি ছাড়া আমাদের কোনও প্রভু বা উপাস্য নেই'![৩৬]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সূরা আরাফে ইরশাদ করেছেন–

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰی ۚۛ شَهِدْنَا ۚۛ اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ ﴿۱۷۲﴾ اَوْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّیَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۷۳﴾

এবং (হে রাসূল! মানুষকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়েছিলেন (আর জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে) আমি কি তোমাদের রব্ব নই? সকলে উত্তর দিয়েছিল, কেন নয়? আমরা সকলে (এ বিষয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি, (এবং এ স্বীকারোক্তি আমি এজন্য

---

[৩৬] মুসানাদে আহমাদ, হাদীস ২১২৩২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩২৫৫ (মুসনাদের চেয়ে কিছুটা বিস্তারিত)। হাকেম রহ. বলেছেন– হাদীসটির সনদ সহীহ। তার এই কথার উপর যাহাবী রহ. আপত্তি করেননি। –অনুবাদক

নিয়েছিলাম) যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম'। কিংবা এরূপ না বল যে, শিরক (-এর সূচনা) তো বহু পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাগণই করেছিল, আর আমরা ছিলাম তাদেরই পরবর্তী বংশধর। তবে কি বিভ্রান্ত লোকদের কৃতকর্মের কারণে আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?

এ হলো আয়াতের তরজমা।

এর ব্যাখ্যায় উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বলেন– আল্লাহ তাআলা সমস্ত আদম সন্তানকে এক জায়গায় একত্র করেছেন এবং তাদের মাঝে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যেমন– নবীদের এক দল, ওলীদের এক দল, শহীদদের এক দল, নেককারদের এক দল, অনুগতদের এক দল এবং নাফারমানদের এক দল। অনুরূপভাবে কাফেরদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন– ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও অগ্নিপূজক ইত্যাদি।

অতঃপর তাদের সকলের আকৃতি বানিয়েছেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে প্রত্যেককে যে আকৃতিতে বানানোর ইচ্ছা সেই আকৃতিতেই সেখানে তাদেরকে হাজির করেছেন। কেউ সুশ্রী, কেউ কুশ্রী, কেউ বোবা, কেউ বধির, কেউ অন্ধ ইত্যাদি। তারপর তাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন।

তারপর সকলকে জিজ্ঞাসা করেছেন– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সকলেই স্বীকার করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিপালক। এরপর তাদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি ছাড়া কাউকে প্রতিপালক ও ইলাহ জানবে না এবং আমি ছাড়া কাউকে মানবে না! তখন সকলেই অঙ্গীকার করেছে। আর আল্লাহ তাআলা এ কথার উপর আসমান-জমিন ও হযরত আদমকে সাক্ষী বানিয়েছেন। সাথে বলে দিয়েছেন, এই স্বীকারোক্তি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নবীগণ আগমন করবে এবং সমূহ কিতাব নাযিল করা হবে।

অতএব প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করেছে এবং শিরককে অস্বীকার করেছে। সুতরাং শিরকের ক্ষেত্রে একে অন্যকে ঢাল বানানো উচিত নয়। না কোনও পীরকে, না কোনও

উস্তাদকে, না বাপ-দাদাকে, না কোনও বাদশাকে, না মৌলভীকে, আর না কোনও বুযুর্গকে।

কেউ যদি মনে করে, আমরা তো দুনিয়াতে এসে ঐ অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়েছি, ভুলা কথার গ্রহণযোগ্যতা কী!– তাহলে তার এই ধারণা ভুল। কারণ অনেক কথাই মানুষ নিজে ভুলে যায়, অতঃপর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা বললে বিশ্বাস করে নেয়।

যেমন– নিজের মায়ের পেট থেকে জন্ম নেওয়ার কথা স্মরণ থাকে না, কিন্তু মানুষের কাছে শুনে বিশ্বাস করে নেয় এবং নিজের মাকেই মা মনে করে, অন্য কাউকে মা ডাকে না।

অতঃপর কেউ যদি নিজের মায়ের হক আদায় না করে বা অন্য কাউকে মা ডাকে, তাহলে সবাই তাকে মন্দ বলে। তখন কেউ যদি এই জবাব দেয় যে, আমার জন্মের কথা তো আমার কিছুই মনে নেই, আমি তাকে মা বলে বিশ্বাস করব কীভাবে? তাহলে সবাই তাকে আহমক ও বেয়াদবই বলবে।

সুতরাং যখন জনসাধারণের বলাতে মানুষের অনেক কথা বিশ্বাস হয়ে যায়, তখন নবীদের শান তো অনেক উঁচু, তাদের সংবাদে কেন বিশ্বাস হবে না?!

এই হাদীস থেকে জানা গেল, রূহের জগতেই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তাওহীদের আদেশবার্তা ও শিরকের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আর সকল নবী-রাসূলগণ সেটারই সমর্থনে আগমন করেছেন এবং সকল আসমানী কিতাব সেটারই বিবরণ নিয়ে নাযিল হয়েছে।

সুতরাং এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর শিক্ষা ও এক শত চারখানা আসমানী কিতাবের[৩৭] ইলমের সারকথা এটাই যে, তাওহীদকে আঁকড়ে

---

[৩৭] নবীদের ও আসমানী কিতাবসমূহের এই সংখ্যা প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। কোনও কোনও মুফাস্সিরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর কোনও প্রমাণ বা সূত্র আমাদের জানা নাই। –নদভী

ধর, শিরক থেকে দূরে থাক; আল্লাহ ছাড়া কাউকে এমন কর্তৃত্বশীল মনে করবে না যে, কোনও কিছুতে স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে মালিক ও প্রতিপালক মনে করবে না যে, তার কাছে নিজের প্রয়োজন কামনা করবে।

ফেতনা ও মুসিবতের সময় তাওহীদের আকীদাকে আঁকড়ে ধরে তার উপর অটল থাকা

হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অসিয়ত করেছেন–

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ.

'তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং জ্বালিয়ে দেওয়া হয়'! -মুসনাদে আহমাদ[38]

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানবে না এবং কোনও জিন বা ভূত ক্ষতি করবে—এই ভয় করবে না!

সুতরাং একজন মুসলিম যেমন বাহ্যিক বিপদাপদের উপর সবর করবে এবং কারও ভয়ে নিজের দ্বীনের ক্ষতি করবে না, ঠিক তেমনি জিন-ভূতের ক্ষতির উপরও ধৈর্য ধারণ করবে এবং ভয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে না।

বরং চিন্তা করবে যে, বাস্তবে তো সবকিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তবে তিনিই কখনো কখনো বান্দাকে পরীক্ষা করেন এবং খারাপদের হাতে ভালোদেরকে কষ্ট দেন, যেন কাঁচা ও পরিপক্কদের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায় এবং মুমিন ও মুনাফেক চিহ্নিত হয়ে যায়।

তাই যেমনিভাবে প্রকাশ্যে ফাসেকদের হাতে মুত্তাকীরা এবং কাফেরদের হাতে মুসলামানরা কষ্ট পায়, তখন নিজের দ্বীন রক্ষার্থে সবর করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না, ঠিক তেমনি কখনো

---

[38] ৩৮. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২০৭৫। —অনুবাদক

কখনো আল্লাহর ইচ্ছায় জিন-শয়তানদের হাতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখনও ধৈর্যধারণ করতে হবে। কিছুতেই তাদের কাছে নতি স্বীকার করা যাবে না।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, কোনও ব্যক্তি যদি শিরকবিমুখ হয়ে অন্যদের আনুগত্য ছেড়ে দেয়, তাদের নামে কুরবানী-মানত করাকে ঘৃণা করে, গলদ রসম-রেওয়াজকে নিশ্চিহ্ন করতে শুরু করে এবং এসব করতে গিয়ে তার জান-মাল ও সন্তানদের কোনও ক্ষতি হয়, কিংবা কোনও পীর-শহীদের নামে কোনও শয়তান ক্ষতি সাধন করে তাহলে সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। আর মনে করবে যে, আল্লাহ আমার দীনদারীর পরীক্ষা নিচ্ছেন।

যেমনি আল্লাহ তাআলা জালিমদেরকে ঢিল দিয়ে পরে পাকড়াও করেন এবং মজলুমদেরকে তাদের হাত থেকে রেহাই দেন, তেমনি জালিম জিনদেরকেও আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত সময়ে পাকড়াও করবেন এবং নেককারদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।

মনিব বিনে অন্য কারও দারস্থ হওয়া গোলামের আত্মমর্যাদাহীনতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বর্ণনা করেন–

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

'এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল– হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? আল্লাহর রাসূল উত্তরে বললেন– আল্লাহর কোনও সমকক্ষ বা শরীক সাব্যস্ত করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (এটা সবচেয়ে বড় গুনাহ)'। –বুখারী ও মুসলিম[৩৯]

---

[৩৯] সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮৬১, ৭৫৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৬১২। –অনুবাদক

অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে যেমন বিশ্বাস কর যে, তিনি সর্বত্র হাজির-নাযির এবং সকল বিষয় তাঁরই এখতিয়ারাধীন, তেমনি বিপদাপদের সময়ও এই বিশ্বাস রেখে তাঁকেই ডাকবে। এরূপ বিশ্বাস রেখে অন্য কাউকে ডাকা যাবে না, কারণ তা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

কারণ প্রথমত, এই ধারণাই সম্পূর্ণ ভুল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হাজত পূরণের ক্ষমতা রাখে বা সর্বত্র হাজির-নাযির। দ্বিতীয়ত, আমাদের স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ তাআলা– তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই আমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের সকল প্রয়োজনে তাঁকেই ডাকব; তাঁরই নিকট প্রার্থনা করব; অন্য কাউকে দিয়ে আমরা কী করব?![৪০]

যেমন– কেউ যদি এক বাদশার গোলাম হয়ে যায়, তাহলে সে তার সকল কাজকে ঐ বাদশার অধীন করে রাখে। অন্য কোনও বাদশার দ্বারস্থ হয় না। আর কোনও মুচির দ্বারস্থ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না!

---

[৪০] যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে– তার মধ্যে লাভ-ক্ষতি এবং দেওয়া ও ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে, শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় তাদের ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি বলেন–
‘তোমরা যারা আল্লাহ ও তাঁর সিদ্দীক বান্দাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ এবং মাখলুকের প্রতি মনোনিবেশ করে তাদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে রেখেছ! আর কতদিন তাদের প্রতি আত্মনিয়োগ করে থাকবে? তারা তোমাদের কী উপকার করে? তাদের হাতে তো লাভ-ক্ষতি কিংবা দেওয়া- নেওয়ার কোনও ক্ষমতাই নেই! লাভ-ক্ষতির বিবেচনায় তাদের মাঝে আর অন্যান্য জড়বস্তুর মাঝে কোনও পার্থক্য নেই! মালিক একজনই; ক্ষতিসাধনকারী একজনই; উপকারকারীও একজনই; আনন্দিত করা ও শাস্তি দান করার ক্ষমতাও একজনের হাতেই; ক্ষমতাপ্রদানকারী এবং বশীভূতকারী একজনই; দান করেন এবং বঞ্চিত করেন একজনই; সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা তো কেবল এক আল্লাহই’। (আল ফাতহুর রব্বানী, ১৩তম মজলিস)। –নদভী

তাওহীদবাদী গুনাহগার তাওবা করে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে, কিন্তু ইবাদতগুযার মুশরিক তা পারে না

জামে তিরমিযীতে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

'আল্লাহ তাআলা বলেন– হে আদমসন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হব'।[৪১]

অর্থাৎ এই দুনিয়াতে সকল গুনাহগাররা গুনাহ করেছে। ফেরাউন-হামান এই দুনিয়াতেই ছিল। বরং শয়তানও তো এই দুনিয়াতেই আছে। এখন মনে কর, এই সকল গুনাহগাররা যত গুনাহ করেছে, এক ব্যক্তিই ঐ পরিমাণ গুনাহ করল, কিন্তু সে শিরক থেকে বেঁচে থাকল, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার যত পরিমাণ গুনাহ আছে তত পরিমাণ ক্ষমা করবেন!

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল, তাওহীদের বরকতে সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যেমন শিরকের কারণে সকল নেক কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

সত্য কথা হলো, শিরক থেকে যখন মানুষ পবিত্র হয়ে যায়– আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মালিক মনে করে না এবং তিনি ছাড়া আর কাউকে আশ্রয়স্থল জ্ঞান করে না, তার অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল থাকে যে, তাঁর হকে ত্রুটিকারী পলায়ন করে অন্য কোথাও আশ্রয়স্থল পায় না। তাঁর বিপরীতে কারও জোর খাটে না। তাঁর সামনে কারও

---

[৪১] জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৪০। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাদীসের এই অংশটি সহীহ মুসলিম (হাদীস ২৬৮৭)-সহ অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আবূ যর রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। –অনুবাদক

সহযোগিতা চলে না এবং নিজ এখতিয়ারে কেউ কারও জন্য সুপারিশও করতে পারে না।

যখন এ কথাগুলো তার মন-মস্তিষ্কে ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তখন যত গুনাহ তার থেকে প্রকাশ পাবে, সেটা হয়তো মানবীয় দুর্বলতার কারণে হবে কিংবা ভুলে হবে এবং এসব গুনাহের ভয় সর্বদা তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। সে এসব গুনাহের কারণে এতটা লজ্জিত ও পেরেশান হবে যে, জীবন থেকেই অতিষ্ঠ হয়ে যাবে।

সন্দেহ নেই, গুনাহের কারণে এমন পেরেশান ব্যক্তির উপর আল্লাহর রহমত হয়। ফলে তার গুনাহ যদি বেশি হয়ে যায়, তার পেরেশানীর হালতও তত বেশি হবে। আর এই হালত যত বাড়বে, আল্লাহর রহমতও তত বাড়বে।

সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ তাওহীদের অধিকারী, তার গুনাহও এমন ভূমিকা কাজ করে যা অন্যদের ইবাদত করতে পারে না। তাওহীদপন্থি ফাসেক, শিরককারী মুত্তাকী থেকে হাজার গুণ উত্তম। যেমন অনুগত দোষী প্রজা চাটুকার বিদ্রোহী থেকে অনেক ভালো। কারণ অনুগত ব্যক্তি তার ত্রুটির উপর লজ্জিত, আর বিদ্রোহী তার কর্মের উপর গর্বিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিরক ফিল-ইলমের খণ্ডন

এই পরিচ্ছেদে ঐ সকল আয়াত-হাদীস উল্লেখ করা হবে, যেগুলোতে 'শিরক ফিল-ইলম' বা ইলমের ক্ষেত্রে শিরকের নিন্দা জানানো হয়েছে।

পঞ্চইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক মানুষের জন্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ

'আর তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের কুঞ্জিসমূহ। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না।[৪২]

অর্থাৎ বাহ্যিক বিষয়াবলি জানার জন্য আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে কিছু মাধ্যম দান করেছেন। যেমন– দেখার জন্য চোখ, শোনার জন্য কান, শোঁকার জন্য নাক, স্বাদ নেওয়ার জন্য জিহ্বা, স্পর্শ করার জন্য হাত, বোঝার জন্য মস্তিষ্ক।

এই মাধ্যমগুলো আল্লাহ তাআলা বান্দাদের এখতিয়ারে দিয়েছেন, ফলে তারা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী এগুলো ব্যবহার করতে পারে।

যেমন– দেখতে মন চাইলে চোখ খুলবে, অন্যথায় খুলবে না; কোনও বস্তুর স্বাদ নিতে চাইলে মুখে দেবে, না চাইলে দেবে না। যেন এসব বিষয় জানার জন্য তাদেরকে চাবি দিয়ে দেওয়া হলো। যেমন কারও হাতে চাবি থাকলে তালা তার এখতিয়ারে থাকে– মন চাইলে খোলে, অন্যথায় না খোলে, তেমনি বহ্যিক বিষয়াবলি জানা মানুষের এখতিয়াধীন– মন চাইলে জানবে, নইলে না জানবে।

---

[৪২] সূরা আনআম, ৫৯

গায়েবের ইলম আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ এবং মানবীয় আওতাবহির্ভূত বিষয়

কিন্তু নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী গায়েব বা অদৃশ্যের বিষয় জানা একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারাধীন এবং তাঁরই শান। কোনও নবী-ওলী, জিন-ফেরেশতা, পীর-শহীদ, ইমাম বা ইমামের পুত্র[৪৩] এবং ভূত-পরীকে আল্লাহ তাআলা এই ক্ষমতা দেননি যে, চাইলেই গায়েবের কোনও বিষয় তারা অবহিত হতে পারবে। বরং আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছায় যাকে যতটুকু ইচ্ছা অবহিত করেন। এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তাদের চাহিদা অনুযায়ী নয়।

এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অনেকবার এমন ঘটেছে যে, কোনও একটি বিষয় জানার আগ্রহ হয়েছে কিন্তু জানতে পারেননি। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলার মর্জি হয়েছে এক মুহূর্তে বলে দিয়েছেন!

যেমন মুনাফিকরা একবার হযরত আয়শা রাযি.-এর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিল। এতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই মর্মাহত হলেন। কয়েকদিন যাবত বিভিন্নভাবে তদন্ত করলেন, কিন্তু আসল বাস্তবতা জানা গেল না। ফলে অনেক পেরেশান হলেন। অতঃপর আল্লাহর যখন মর্জি হলো তখন জানিয়ে দিলেন যে, এই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী এবং আয়শা সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

অতএব এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, গায়েবের ভাণ্ডারের চাবি একমাত্র আল্লাহর হাতে। এই চাবি তিনি অন্য কারও হাতে দেননি। তাঁর কোনও খাজাঞ্চি নেই, বরং নিজ হাতে তালা খুলে যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন। কেউ তার হাত রুখতে পারে না।

---

৪৩. অনেক শিয়াদের বিশ্বাস হলো, তাদের বারো ইমাম গায়েব জানতেন এবং অদৃশ্যের বিষয়ে অবগত হতেন। তারা বংশপরম্পরায় এই বিশ্বাস ধারণ করে আসছে! –নদভী

যে নিজের ব্যাপারে বা অন্য কারও ব্যাপারে স্বতন্ত্র ও স্থায়ীভাবে গায়েব জানার দাবি করে, সে মিথ্যুক ও পাপী

পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেল, কেউ যদি দাবি করে যে, আমার নিকট এমন ইলম আছে, যার মাধ্যেমে আমি যখন ইচ্ছা গায়েবের কথা জানতে পারি এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে অবগত হওয়ার ক্ষমতা আমার আছে– তাহলে সে মিথ্যাবাদী; সে মূলত খোদা হওয়ার দাবি করছে!

আর কেউ যদি কোনও নবী-ওলী, জিন-ফেরেশতা, ইমাম বা ইমামের সন্তান, পীর-শহীদ, গণক-জ্যোতিষী, কিতাব ইত্যাদির মাধ্যমে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ধারণকারী[৪৪], ভবিষ্যদ্বক্তা-পুরোহিত কিংবা কোনও জিন-পরীর ব্যাপারে এমন বিশ্বাস করে যে, তারা গায়েবের কথা বা ভবিষ্যতের বিষয় জানে, তাহলে সে মুশরিক হয়ে যাবে এবং উক্ত আয়াতের অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে!

এখন সংশয় জাগতে পারে যে, কখনো কখনো কোনও জ্যোতিষী-গণক বা পুরোহিত একটা কথা বলে এবং বাস্তবেও তেমনি ঘটে, এতে তো তাদের গায়েব জানার প্রমাণ পাওয়া যায়– তো এই সংশয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ তাদের অনেক কথাই অবাস্তব প্রমাণিত হয়। তাতে বোঝা যায় যে, গায়েবের ইলম তাদের এখতিয়ারাধীন নয়। কখনো তাদের অনুমান সঠিক হয় আর কখনো গলদ হয়।

এস্তেখারা ও কাশফের অবস্থাও এমনই।

---

৪৪. হিন্দুস্তানে ও হিন্দুস্তানের বাইরে অনেক লোকের অভ্যাস আছে, যখন তাদের নিকট কোনও বিষয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়, তখন এমন কোনও একটি কিতাব হাতে নেয় যার লেখক সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা রয়েছে। অতঃপর অনির্দিষ্টভাবে কিতাবটি খোলে। এভাবে যে পৃষ্ঠাটি বের হয়, তা থেকে লক্ষণ নির্ধারণ করে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে ইরান ও ভারত উপমহাদেশে সর্বাধিক নির্ভর করা হয় ইরানের সূফী কবি হাফিয (৭৯৩ হিজরী)-এর কাব্যসমগ্রের উপর। এটাকে তারা 'লক্ষণ দেখা' বলে। –নদভী

পক্ষান্তরে নবীদের ওহীতে কোনও ভুল নেই এবং ওহী তাদের এখতিয়ারাধীন নয়। আল্লাহ্ যা চান বলে দেন; তাদের কোনও মর্জি চলে না।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۭ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝٦٥

'বলে দাও, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। এবং মানুষ জানে না তাদেরকে কখন পুনর্জীবিত করা হবে'।[৪৫]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি লোকদেরকে বলে দাও– গায়েবের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, মানুষ-ফেরেশতা-জিন কেউ না। অর্থাৎ গায়েবের বিষয় জানা কারও এখতিয়ারে নেই।

এর দলীল হলো, সকল মুমিন জানে যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, কিন্তু কেউ জানে না কবে হবে। সুতরাং সব জিনিস জানা যদি তাদের এখতিয়ারে থাকত, তাহলে এটাও জানত।

ভবিষ্যতের যেসব বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়

আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۭ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۭ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝٣٤

'নিশ্চয়ই কিয়ামত (-এর ক্ষণ) সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কী আছে। কোনও প্রাণী জানে না সে আগামীকাল কী অর্জন করবে এবং

---

[৪৫] সূরা নামল, ৬৫

কোনও প্রাণী এটাও জানে না যে, কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, সবকিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখেন'।[৪৬]

অর্থাৎ গায়েবের সকল বিষয়ের সংবাদ একমাত্র আল্লাহর নিকটে রয়েছে। এগুলো জানা অন্য কারও এখতিয়ারে নেই।

যেমন– কিয়ামতের আগমনের বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ এবং সুনিশ্চিত, কিন্তু আগমনের সময় সম্পর্কে কেউ জানে না। তাহলে অন্যান্য বিষয় জানা তো আরও দূরবর্তী বিষয়! যেমন– কারও জয়-পরাজয় কিংবা সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়গুলো তো কিয়ামতের মত প্রসিদ্ধ না এবং সুনিশ্চতও না।

অনুরূপভাবে কখন বৃষ্টি হবে তা সুনিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। অথচ এর মৌসুম নির্ধারিত, সাধারণত সেই মৌসুমেই বৃষ্টি হয়। এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে নবী-ওলী, পীর-বুযুর্গ ও রাজা-প্রজা সকলেই বৃষ্টির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। যদি এর সময় জানার কোনও রাস্তা থাকত, তাহলে কেউ না কেউ তা পেয়ে যেত।

তাহলে যেসব জিনিসের কোনও মৌসুম নেই এবং সকল মানুষ তা জানার আগ্রহও রাখে না, যেমন : কারও মরা-বাঁচা, সন্তান হওয়া, ধনী বা গরিব হওয়া, জয়-পরাজয় ইত্যাদি– এসব বিষয় জানার রাস্তা কোথায় পাবে?!

এমনিভাবে মায়ের গর্ভে যে বীর্য প্রবেশ করে, তা সম্পর্কে কেউ বলতে পারে না যে, একটি হবে নাকি জমজ, পুত্র হবে নাকি কন্যা, পূর্ণ-সুঠাম নাকি বিকলাঙ্গ, সুশ্রী হবে নাকি কুশ্রী ইত্যাদি। অথচ ডাক্তাররা বিশদভাবে এসবের কারণ উল্লেখ করে থাকে। কিন্তু তারা সুনিশ্চিতভাবে কিছুই জানে না।

---

[৪৬] সূরা লুকমান, ৩৪

মানুষের অন্তরের বিষয় জানা সম্ভব নয়

তাহলে অন্যান্য যেসব জিনিস মানুষের মনের মধ্যে লুকায়িত থাকে, যেমন : কল্পনা-জল্পনা, নিয়ত-এরাদা ও ঈমান-নেফাক ইত্যাদি– সেগুলো কীভাবে জানবে?!

অনুরূপভাবে যখন মানুষ নিজের ব্যাপারেই জানে না যে, আগামীকাল তার কী অবস্থা হবে তাহলে অন্যের অবস্থা কীভাবে জানবে?! আর সে যখন নিজের মৃত্যুর জায়গা সম্পর্কেই অবগত নয়, তখন অন্যের মৃত্যুর ক্ষণ বা স্থান সম্পর্কে কোত্থেকে জানবে?! মোটকথা, ভবিষ্যতের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নিজ এখতিয়ারে কিছু জানতে পারে না।

গায়েবি বিষয়ে সংবাদ প্রদানের দাবিদারদের স্বরূপ

এ আয়াত থেকে জানা গেল, যেসব লোক গায়েব জানার দাবি করে কিংবা (সুনিশ্চিত) কাশফ হওয়ার দাবি করে, তাদের কেউ এস্তেখারার আমল শিখায়[৪৭], কেউ পঞ্জিকা দেখে অদৃশ্যের খবর দেয়, কেউ আবার রাশিনামার চক্করে পড়ে তারা সবাই মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ। তাদের ফাঁদে কখনো পা দেবে না।

তবে যে ব্যক্তি গায়েব জানার দাবি করে না এবং গায়েবের বিষয় জানার আগ্রহও রাখে না, কেবল এতটুকু বলে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনো কখনো আমি কিছু বিষয় অবগত হই, তবে এটা আমার এখতিয়ারাধীন নয় যে, যখন যা চাই জানতে পারি– তাহলে এটা সম্ভব হতে পারে। হতে পারে সে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী।

---

[৪৭] শিয়াদের মধ্যে ইমামিয়া সম্প্রদায় ও কতক 'সূফী' দাবিদার লোকেরা এস্তেখারার ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করেছে এবং এর বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করেছে। তারা সাধারণ থেকে সাধারণ ব্যাপারেও এগুলোর উপর নির্ভর করে এবং বিশ্বাস করে যে, এসব এস্তেখারায় কখনো ভুল হয় না। লেখক এই ধরনের এস্তেখারাকেই বুঝিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে মাসনূন এস্তেখারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের শিক্ষা দিতেন, সেটা আল্লাহর নিকট কল্যাণকামনা ও দুআর একটি তরীকা। –নদভী

দুআর উদ্দেশ্যে দূর বা কাছ থেকে মৃতদের ডাকা ইলমের ক্ষেত্রে শিরকের নামান্তর

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ⑤

'তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয় এবং তাদের ডাক সম্পর্কে তাদের খবর পর্যন্ত নেই'।[৪৮]

অর্থাৎ শিরককারীরা অত্যন্ত আহমক। তারা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে ডাকে। এতে তারা তাদের ডাকই শুনতে পায় না, অপরদিকে তাদের কোনও ক্ষমতাও নেই। যদি কেউ কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে ডাকে তাহলেও তারা কিছু করতে পারবে না।

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, যে সকল লোক পূর্ববর্তী বুযুর্গদেরকে দূরদূরান্ত থেকে ডেকে বলে, হযরত! আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন, যেন তিনি নিজ কুদরতে আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেন। আর মনে করে যে, আমরা কোনও শিরক করিনি। কারণ আমরা তার নিকট সাহায্য চাইনি, বরং তার মাধ্যমে কেবল দুআ করিয়েছি[৪৯]– তাদের এই ধারণা ভুল।

---

[৪৮] সূরা আহকাফ, ৫

[৪৯] সালাফের পরবর্তী যুগে মানুষের মাঝে কবরস্থ ব্যক্তিদের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা ও তাদের নিকট দুআ চাওয়ার একটি গলদ প্রথা চালু হয়েছে। কতক মাশায়েখ এই কাজটি ব্যাপকভাবে করেছেন। তাদের ধারণা ছিল, এটা নিছক কবরস্থ ব্যক্তির রূহানিয়াত থেকে উপকৃত হওয়া ও তাদের কাছে দুআ চাওয়া।

তবে মুহাক্কিক ফকীহ ও সূফীগণ শিরকের রাস্তা বন্ধ করার স্বার্থে এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। কারণ বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ভ্রমাত্মক। কতটুকু উদ্দেশ্য আর কতটুকু উদ্দেশ্য নয় তার মাঝে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন। ফলে জনসাধারণের ব্যাপারে আশঙ্কা আছে যে, তারা এর মাধ্যমে শিরক ও মৃতদের নিকট সাহায্য চাওয়ায় লিপ্ত হয়ে যাবে। =

কারণ এখানে সাহায্য চাওয়ার দিক থেকে যদিও শিরক হয়নি, কিন্তু দূর থেকে ডাকার মাধ্যমে শিরক হয়েছে। কেননা এই ডাকার মধ্যে এই বিশ্বাস নিহিত রয়েছে যে, ঐ বুযুর্গ দূরে ও কাছে সমান শুনতে পায়, তাই তো সে দূর থেকে এভাবে ডেকেছে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে বলছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর যারা আছে (অর্থাৎ মাখলুক) তারা আহ্বানকারীর আহ্বান থেকে সম্পূর্ণ বেখবর।

= তাছাড়া ইসলামে আসল কাম্য হলো, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাধারণ বিষয়াবলি ছাড়া সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

এই গলদ প্রথাটি অনেক আগ থেকেই চলে আসছে এবং প্রত্যেক যুগের আলেমগণ এর উপর আপত্তি জানিয়েছেন। আল্লামা শাইখ আবদুল হক দেহলভী রহ. (১০৫২ হিজরী), যিনি একই সাথে মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং সূফী ছিলেন এবং নিজেও এসব মাসআলায় কিছুটা ছাড়ের প্রবক্তা ছিলেন, তাঁর রচিত বিভিন্ন কিতাবে মৃতদের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করার পক্ষে কথা বলেছেন, সেই তিনিও মিশকাত শরীফের ফার্সী টীকা আশিয়্যাতুল লামাআতে লেখেন–

হ্যাঁ, যদি কবর যিয়ারতকারীরা আল্লাহর প্রতি আত্মনিয়োগ করা ও তাঁর নিকট রোনাজারি বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতা ও স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের ধারণা রাখে, যেমনটি মূর্খ জনসাধারণ মনে করে থাকে এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ ও বিভিন্ন হারাম কাজ করে, যেমন– কবরে চুমু খাওয়া, কবরে সেজদা করা, কবরের সামনে নামায পড়া ইত্যাদি শরীয়তবিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, হারাম এবং ফাসেদ আকীদা।

(আশিয়্যাতুল লামাআত, জিহাদ অধ্যায়, বদরে মৃতদের ঘটনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।)

অনুরূপভাবে আল্লামা শাইখ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (১২৩৯ হিজরী) বলেন–

নেককারদের রূহ থেকে সাহায্য লাভের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানরা অনেক বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। মূর্খ জনসাধারণ যা করে থাকে এবং তাদের ক্ষেত্রে যে স্বতন্ত্র ক্ষমতার বিশ্বাস করে তা নিঃসন্দেহে বড় শিরক!

(ফাতাওয়া শাইখ আব্দুল আযীয, পৃ. ১২১)। –নদভী

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বাধীন ক্ষমতা রাখতেন না এবং স্বতন্ত্রভাবে গায়েবের ইলম জানতেন না

আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ ۚۛ وَ مَا مَسَّنِیَ السُّوْٓءُ ۚۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ وَّ بَشِیْرٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

‘বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা না করেন, আমি আমার নিজেরও কোনও উপকার ও অপকারের ক্ষমতা রাখি না। আমার যদি গায়েব সম্পর্কে জানা থাকত, তবে ভালো-ভালো জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে নিতাম এবং কোনও রকম কষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা– সেই সকল লোকের জন্য, যারা (আমার কথা) মানে’।[৫০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী-ওলীদের সর্দার ছিলেন। মানুষ তাঁর অনেক বড় বড় মুজিযা দেখেছে। তাঁরই কাছ থেকে সবাই দ্বীনের একান্ত বিষয় জেনেছে। সকল বুযুর্গের বুযুর্গীও কেবল তাঁরই অনুসরণে অর্জিত হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিজের অবস্থা লোকদের সামনে স্পষ্ট করো, যেন এর মাধ্যমে অন্য সবার অবস্থা জানা হয়ে যায়।

সুতরাং তিনি বলে দিয়েছেন– আমার না আছে কোনও ক্ষমতা আর না আমি গায়েবের কোনও বিষয় জানি। আমার ক্ষমতার তো এমন অবস্থা যে, অন্যের কথা দূরে থাক, আমি নিজেরও কোনও উপকার বা অপকারের সামর্থ্য রাখি না!

গায়েব জানা যদি আমার এখতিয়ারে থাকত, তাহলে আমি সকল কাজের পরিণাম শুরুতেই জেনে যেতাম! পরিণাম ভালো জানা গেলে সেটা করতাম আর মন্দ জানা গেলে শুরুতেই তা থেকে বিরত থাকতাম!

---

[৫০] সূরা আরাফ, ১৮৮

মোটকথা, কোনও ক্ষমতা এবং গায়েবের কোনও ইলম আমার কাছে নেই। আর না আমি কোনও খোদা হওয়ার দাবি করি। আমি তো কেবল পয়গম্বর হওয়ার দাবি করি। আর পয়গম্বরের দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে, মন্দ কাজ দেখলে সতর্ক করবে এবং ভালো কাজে সুসংবাদ শোনাবে। আর এই সতর্কতা ও সুসংবাদও কেবল তাদেরকে উপকার করে যাদের অন্তরে ঈমান আছে। তবে অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা আমার কাজ না, সেটা কেবল আল্লাহর কাজ।

নবী-ওলীগণের মর্যাদা স্বাধীন কর্মক্ষমতা এবং স্বতন্ত্রভাবে গায়েব জানার মধ্যে নিহিত নয়

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, অন্য লোকদের তুলনায় নবী-ওলীদেরকে আল্লাহ তাআলা যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেই শ্রেষ্ঠত্ব এটাই যে, তারা আল্লাহর পথ দেখান এবং তারা জ্ঞান রাখেন– ভালো কাজ কোনটি, মন্দ কাজ কোনটি এবং লোকদেরকে তা শেখান। আল্লাহ তাআলা তাদের কথায় প্রভাব দান করেন, ফলে অনেক লোক তাতে সরল পথে চলে আসে।

এ ছাড়া পৃথিবীতে স্বাধীন কর্তৃত্ব করার দিক থেকে নবী-ওলীদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেই ক্ষমতা দেননি যে, তারা যাকে চাবে মেরে ফেলবে; কাউকে সন্তান দান করবে; কারও বিপদাপদ দূর করে দেবে; কারও কামনা-বাসনা পূরণ করবে; জয়-পরাজয় দান করবে; কাউকে ধনী বা গরিব বানিয়ে দেবে; কাউকে রাজা-বাদশা ও উজির বানিয়ে দেবে বা কারও থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে; কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেবে বা কারও থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেবে; কোনও অসুস্থকে সুস্থ করে দেবে বা সুস্থকে অসুস্থ বানিয়ে দেবে—এসব বিষয়ে নবী-ওলীদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন কোনও ক্ষমতা দেননি। বরং এসব ক্ষেত্রে সকল বান্দা সমান অক্ষম!

অনুরূপভাবে গায়েবের বিষয়াদি জানার ক্ষেত্রেও তাদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গায়েবের বিষয়াদি জানার এখতিয়ার দেননি যে, তারা যে কারও দিলের অবস্থা যখন ইচ্ছা জানতে পারবে; গায়েবের যে কোনও বিষয় যখন ইচ্ছা জেনে নেবে, যেমন– অমুক ব্যক্তি জীবিত আছে নাকি মরে গেছে, বা কোন্ শহরে কী অবস্থায় আছে ইত্যাদি; ভবিষ্যতের যে কোনও বিষয় যখন ইচ্ছা জানতে পারবে, যেমন– অমুকের সন্তান হবে, অমুক ব্যবসায় লাভ হবে নাকি লোকসান হবে, এই যুদ্ধে জয়ী হবে নাকি পরাজিত ইত্যাদি— এই সকল বিষয়ে ছোট-বড় সকল বান্দা সমান বেখবর এবং অজ্ঞ।

সুতরাং যেমন অন্য সব মানুষ কখনো বোধবুদ্ধি থেকে বা আলামত দেখে কোন একটি কথা বলে দেয়, পরে ঘটনক্রমে কখনো তা বাস্তব হয়, ঠিক তেমনি এই সকল নবী-ওলীরাও যে কথা বোধ ও উপলব্ধি থেকে বা কোন লক্ষণ দেখে বলে তা কখনো বাস্তব হয়, আর কখনো ভুল হয়। তবে যে কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে লাভ হয়, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু তা তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে গায়েব জানার সম্বন্ধ করায় আপত্তি করেছেন, এমনকি কবিতায়ও

হযরত রুবায়্যি' বিনতে মুআওয়িয রাযি. বলেন–

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ، فَقَالَ: «دَعِيْ هٰذِهِ، وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ».

'আমার বাসর রাতের পরের দিন সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং আমার বিছানার উপর বসলেন যেমন তুমি বসে আছ। তখন আমাদের ছোট ছোট মেয়েরা

দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়া আমার বাপ-দাদার শোকগাঁথা গাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের একজন বলে বসল– আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন যিনি আগামীকাল কী হবে তা জানেন! তখন তিনি বললেন– এ কথা বাদ দাও, আগে যা বলছিলে তাই বল’। -বুখারী[৫১]

হযরত রুবায়্যি’ একজন আনসারী নারী ছিলেন। তার বিবাহের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং তার কাছে বসলেন। তখন তাদের কতক বালিকা কিছু কবিতা আবৃত্তি করছিল। এক পর্যায়ে তারা রাসূলের প্রশংসায় বলে উঠল- তাঁকে আল্লাহ তাআলা এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, তিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বারণ করলেন এবং বললেন– এটা বাদ দাও, আগে যা গাচ্ছিলে তাই গাও!

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, কোনও নবী-ওলী বা ইমাম-শহীদের ব্যাপারে কখনোই এই আকীদা পোষণ করা যাবে না যে, তারা গায়েব জানেন! এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেও এরূপ আকীদা রাখা যাবে না এবং এমন প্রশংসা করা যাবে না!

এই যে কবি-সাহিত্যিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় কিংবা নবী-ওলী, পীর-বুযুর্গ বা উস্তাদদের প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করে এবং তাদের প্রশংসায় খোদায়ীসুলভ গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে, আর বলে যে, কবিতায় অতিশয়োক্তি চলে– তাদের এই কথা সম্পূর্ণ গলদ! যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বালিকাদেরকে তাঁর প্রশংসায় এ জাতীয় কবিতা বলতে দিলেন না,

---

[৫১] সহীহ বুখারী, হাদীস ৫১৪৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯২২; জামে তিরমিযী, হাদীস ১০৯০।
আর সুনানে ইবনে মাজাহ'র বর্ণনায় (হাদীস ১৮৯৭) এ কথাও আছে যে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– ‘এ কথা বাদ দাও, কারণ আগামীকাল কী হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না’। –অনুবাদক

তখন সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কোনও ব্যক্তি কি এগুলো বলতে বা শুনতে পছন্দ করতে পারে!

- হযরত আয়শা রাযি. বলেন–

مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا... يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِيْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ﴾ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ.

'যে তোমাকে বলে– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাঁচটি বিষয়ে জানতেন যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, সেগুলোর ইলম একমাত্র তাঁরই নিকট রয়েছে (দ্রষ্টব্য– সূরা লুকমান, ৩৪), সে বড় মিথ্যা রটনা করল!'- বুখারী[৫২]

অর্থাৎ সূরা লুকমানের শেষে যে পাঁচটি বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং যার ব্যাখ্যা এই পরিচ্ছেদের শুরুতে গিয়েছে, গায়েবের সকল বিষয় মূলত এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং যে বলবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাঁচটি বিষয় জানতেন, অর্থাৎ গায়েবের সকল বিষয় জানতেন, সে বড়ই মিথ্যাবাদী। কারণ গায়েবের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

---

[৫২] উল্লিখিত শব্দ মূলত জামে তিরমিযী (হাদীস ৩২৭৮)-এর। আর সহীহ বুখারী (হাদীস ৪৮৫৫)-এর বর্ণনায় শব্দ এমন– 'আর যে তোমাকে বলে যে, তিনি আগামীকাল কী হবে তা জানেন, সে মিথ্যা বলল! অতঃপর আয়শা রাযি. সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াত পাঠ করেছেন'।

লেখক হাদীসটি মিশকাতের হাওয়ালায় উল্লেখ করেছেন। সেখানেও উল্লিখিত শব্দ তিরমিযীর বর্ণনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বুখারী ও মুসলিম রহ. হাদীসটি শব্দের সামান্য ভিন্নতাসহ বর্ণনা করেছেন। আর গায়েবের এই পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না মর্মে সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস রয়েছে।

দেখুন– সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৬৯৭ ও ৭৩৮৯; সুনানে কুবরা নাসাঈ, হাদীস ১১১৯৪। –অনুবাদক

- বুখারী শরীফে হযরত উম্মুল ‘আলা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَاللهِ مَا أَدْرِيْ -وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ- مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ.

‘আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও এটা জানি না যে, আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে!’।[৫৩]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে, কবরে বা আখেরাতে স্বীয় বান্দাদের সাথে কী আচরণ করবেন, তা সুনিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। চাই সে নবী হোক বা ওলী, নিজের অবস্থা হোক বা অন্যদের অবস্থা!

আর কোনও বিষয়ে যদি আল্লাহ তাআলা কোনও খাস বান্দাকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত করেন যে, অমুক কাজের পরিণাম ভালো আর অমুক কাজের পরিণাম মন্দ– তো সেটা একটা সংক্ষিপ্ত কথা। এর চেয়ে বেশি জানা এবং এর বিস্তারিত বিবরণ লাভ করা তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

---

[৫৩] সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শির্ক ফিত-তাসার্রুফের খণ্ডন

এই পরিচ্ছেদে ঐ সকল আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হবে, যেগুলোতে নিরঙ্কুশ কর্মক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে শিরকের নিন্দা করা হয়েছে।

সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য প্রমাণিত, এ ব্যাপারে সর্বকালের মানুষের ঐকমত্য

আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّ هُوَ یُجِیْرُ وَ لَا یُجَارُ عَلَیْهِ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰی تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

'বল, কে তিনি, যার হাতে সবকিছুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, (বল) যদি জান? তারা অবশ্যই বলবে, (সমস্ত কর্তৃত্ব) আল্লাহর। বল, তবে কোথা হতে তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছ?'[৫৪]

অর্থাৎ যার কাছেই জিজ্ঞাসা করবে যে, এমন শান কার আছে যে, সকল জিনিস তার আয়ত্তাধীন, তিনি যা চান করে ফেলেন; যার হাত কেউ রুখতে পারে না; যার সাহায্য থাকলে কোনও বিষয় না হয়ে পারে না; যার হকে ক্রটিকারী কোথাও আশ্রয় পায় না; যার মোকাবেলায় কারও সাহায্য কাজে আসে না? প্রত্যেকেই উত্তর দেবে, এটা তো কেবল আল্লাহ্ তাআলার শান!

সুতরাং বোঝা দরকার, তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়া কেবলই পাগলামি।

---

[৫৪] সূরা মুমিনূন, ৮৮-৮৯

আল্লাহর ব্যাপারে জাহিলী সমাজের আকীদা ও তাদের শিরকের স্বরূপ

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কাফেররাও এ কথা স্বীকার করত যে, আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর মোকাবেলা কেউ করতে পারে না। তবে মূর্তিদেরকে আল্লাহর নিকট নিজেদের উকিল মনে করার কারণে তারা কাফের হয়ে গেছে। সুতরাং এই যুগেও কেউ যদি কোনও মাখলূককে পৃথিবীতে স্বাধীন কর্তৃত্বশীল ও আল্লাহর নিকট নিজের উকিল মনে করে, তাহলে তার উপর শিরক সাব্যস্ত হবে, যদিও সে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে না করে এবং আল্লাহর মোকাবেলা করার সামর্থ্য তার জন্য সাব্যস্ত না করে!

নবী-ওলীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মুশরিকদের অনুকরণ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَن يُّجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ أَحَدٌ ۙ وَّلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

'বলে দাও, আমি তোমাদের কোনও ক্ষতি করার এখতিয়ার রাখি না এবং কোনও উপকার করারও না। বলে দাও, আমাকে আল্লাহ হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং আমিও তাঁকে ছেড়ে অন্য কোনও আশ্রয়স্থল পাব না' ।[৫৫]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, লোকদের বলে দাও– আমি তোমাদের উপকার-অপকারের মালিক নই। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনার কারণে এবং আমার উম্মতের মধ্যে শামিল হওয়ার কারণে ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে সীমালঙ্ঘন করো না যে, আমাদের খুঁটি খুবই মজবুত এবং আমাদের উকিল বড়

---

[৫৫] সূরা জিন, ২১-২২

জবরদস্ত এবং আমাদের সুপারিশকারী খুবই প্রিয়ভাজন। তাই আমরা যা খুশি করি, তিনি আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবেন! এই ধারণা সম্পূর্ণ গলদ। কেননা আমি আল্লাহকেই ভয় করি এবং তিনি ছাড়া আমার নিজের বাঁচার কোনও পথ জানা নাই, সুতরাং অন্যকে কী বাঁচাব!

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, সে সকল লোক নিজেদের পীর-মুর্শিদদের উপর ভরসা করে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের ভক্তি-শ্রদ্ধা উপেক্ষা করে– এটা সম্পূর্ণ গোমরাহী। কারণ সকল পীরের পীর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যেখানে সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকেন এবং তাঁর রহমত ছাড়া নিজের মুক্তির কোনও পথ দেখেন না, সেখানে অন্য পীরদের কী অবস্থা হবে!!

নবী-ওলী পৃথিবীতে স্বাধীন হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ يَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ شَيۡـًٔا وَّ لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ۝

'তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব জিনিসের ইবাদত করে, যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে তাদেরকে কোনওভাবে রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং তা রাখতে সক্ষমও নয়'।[৫৬]

অর্থাৎ তারা আল্লাহর মত করে এমন সব লোকের তাযীম করে, যাদের কোনও ক্ষমতা নেই। অন্যদের রিযিক পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের কোনও দখল নেই। না তারা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে, আর না জমিন থেকে কোনও শস্য উৎপন্ন করে! আসলে তাদের কোনও ধরনের ক্ষমতাই নেই।

---

[৫৬] সূরা নাহ্‌ল, ৭৩

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, যে সকল লোক বলে থাকে যে, নবী-ওলী ও ইমাম-শহীদদের পৃথিবীতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে। তবে তারা আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট। তাই আল্লাহর আদব রক্ষার্থে তারা কোনও হস্তক্ষেপ করে না। তারা চাইলে তো এক মুহূর্তে সবকিছু ওলট-পালট করে দিতে পারে। কিন্তু শরীয়তের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে তারা হাত গুটিয়ে বসে আছে– তাদের এই সকল কথা গলদ। কোনও বিষয়ে না তাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আছে, আর না তাদের সেই ক্ষমতা আছে।

- আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

'আল্লাহ্ তাআলাকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকবে না, যা তোমার কোনও উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। তারপরও যদি তুমি এরূপ কর তবে তুমি জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে'।[৫৭]

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পরিবর্তে এমন অক্ষমদেরকে ডাকা যারা উকপারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না– একেবারেই অন্যায়। কারণ এক মহান সত্তার অনুরূপ মর্যাদা এই সকল অকর্মাদেরকে দেওয়া হচ্ছে!

সুপারিশ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজা-বাদশাদের রীতিনীতি ও সুপারিশকারীদের শ্রেণিবিভাগ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّ مَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ

---

[৫৭] সূরা ইউনুস, ১০৬

الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا ۙ قَالَ
رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۲۳﴾

'(হে রাসূল! ওই কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে, তাদেরকে ডাক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয় এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (কোনও বিষয়ে আল্লাহর সাথে) তাদের কোনও অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। যার জন্য তিনি (সুপারিশের) অনুমতি দেন, তার ছাড়া (অন্য কারও) কোনও সুপারিশ আল্লাহর সামনে কাজে আসবে না। পরিশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করে দেওয়া হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা উত্তর দেয়, সত্য (কথা বলেছেন) এবং তিনিই সমুচ্চ, মহান'।[৫৮]

অর্থাৎ কেউ যদি কারও কাছে সাহায্য চায়, বিপদের সময় ডাকে, আর সে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয় তাহলে এর কয়েকটি সুরত হতে পারে। হয়ত সে নিজেই মালিক, কিংবা মালিকের শরীক অথবা মালিকের উপর তার প্রভাব রয়েছে।

যেমন– বড় বড় আমীরদের কথা বাদশা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেয়। কেননা তারা তার ডান হাত এবং তার রাজ্যের স্তম্ভ। তারা বেজার হলে রাজ্য বিগড়ে যাবে। অথবা সুপারিশকারী এমন যে, মালিকের কাছে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কবুল করে নেয়। দিল থেকে খুশি হোক কিংবা বেজার। যেমন– কন্যা ও স্ত্রীগণ। মুহাব্বতের কারণে বাদশা তাদের সুপারিশ রদ করতে পারে না। ফলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাদের সুপারিশ কবুল করে নেয়।

---

[৫৮] সূরা সাবা, ২২-২৩

সুপারিশগ্রহণ ও প্রভাবশালীদের সন্তুষ্টকরণের ক্ষেত্রে দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের সাথে আল্লাহর কোনও তুলনা চলে না

এখন আল্লাহকে ছেড়ে এসব লোক যাদেরকে ডাকে এবং যাদের কাছে সাহায্য কামনা করে, তারা তো আসমান-জমিনে অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয় এবং তাদের কোনও অংশীদারিত্বও নেই। আবার তারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের স্তম্ভ বা তাঁর ডান হাতও নয় যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কথা মেনে নেবেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার ক্ষমতাও রাখে না যে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মঞ্জুর করে নেবেন।

বরং তাঁর দরবারে তাদের অবস্থা তো এমন যে, তিনি যখন কিছু বলেন, তখন তারা ভয়ে বেহুঁশ হয়ে যায় এবং আদব ও ভয়ের কারণে কথাটি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার হিম্মতটুকু করতে পারে না। তাই একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে। পরস্পর আলোচনা দ্বারা যখন কথাটি সবাই বুঝে নেয় তখন 'ঈমান আনলাম ও মেনে নিলাম' ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। নির্দেশ পাল্টে দেওয়া বা কারও ওকালতি করার তো প্রশ্নই আসে না।

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে যেসব সুপরিশ চলবে না

এখানে একটি কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে রাখা দরকার। তা হলো, অধিকাংশ লোক নবী-ওলীদের সুপারিশের উপর অতিরিক্ত ভরসা রাখে। তারা সুপারিশের গলদ অর্থ বুঝে আল্লাহকেই ভুলে গেছে। সুতরাং সুপারিশের হাকীকত বুঝতে হবে।

সুপারিশকে আরবীতে শাফাআত বলে। দুনিয়াতে সুপারিশ কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– বাদশার নিকট কোনও ব্যক্তির চুরি প্রমাণিত হলো। তখন কোনও আমীর বা মন্ত্রী সুপারিশ করে তাকে বাঁচিয়ে দিল। সুপারিশের একটি প্রকার এটি।

বাদশার মন তো চায় যে, চোরকে পাকড়াও করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হোক। কিন্তু ওই আমীরের কারণে বাধ্য হয়ে তার সুপারিশ মেনে নেয় এবং চোরের অপরাধ মার্জনা করে দেয়। কারণ ওই আমীর তার সাম্রাজ্যের একজন বড় রুকন বা স্তম্ভ। সে তার রাজত্বের শোভা বর্ধন করে। তাই বাদশা চিন্তা করে, একবার রাগ সংবরণ করা আর একজন চোরকে মাফ করে দেওয়া এত বড় একজন আমীরকে বেজার করার চেয়ে অনেক ভালো। কারণ তাকে বেজার করলে বড় বড় কাজ বিগড়ে যাবে এবং রাজত্বের শান-শওকত কমে যাবে। এটাকে 'শাফাআতে ওয়াজাহাত' বলে। অর্থাৎ ওই আমীরের ওয়াজাহাত বা মর্যাদার কারণে তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হয়েছে।

এই ধরনের সুপারিশ আল্লাহর নিকট কোনওভাবেই চলবে না। কেউ যদি কোনও নবী-ওলী, ইমাম-শহীদ কিংবা কোনও ফেরেশতা বা পীরকে আল্লাহর দরবারে এমন সুপারিশকারী মনে করে তাহলে সে খাঁটি মুশরিক। সে এত বড় মূর্খ যে, খোদা হওয়ার অর্থ কী তাই জানে না এবং রাজত্বের মালিক ওই মহান সত্তার কোনও মর্যাদাই সে বোঝে না।

এই শাহানশাহের শান্ তো এমন যে, তিনি চাইলে একটি 'কুন' হুকুম দ্বারা এক মুহূর্তের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরাঈলের মত কোটি কোটি নবী-ফেরেশতা এবং ওলী-জিন সৃষ্টি করতে পারেন। অনুরূপভাবে আরশ থেকে জমিন পর্যন্ত সারা বিশ্বকে এক মুহূর্তের মধ্যে তছনছ করে দিয়ে[৫৯] তার জায়গায় আরেকটি বিশ্ব

---

[৫৯] আল্লাহ তাআলার এই বড়ত্ব-মহত্ত্ব ও মাখলুক থেকে অনপেক্ষতার সামনে বড় বড় ওলী-আরেফরা বিনয়াবনত হয়েছেন এবং তাঁর অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা-ক্ষমতার সামনে নিজেদের ভীতি ও হতবুদ্ধিতা প্রকাশ করেছেন। এসব আরেফদের মধ্যে রয়েছেন হিন্দুস্তানের বড় বুযুর্গ, শাইখ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরী বিহারী (মৃ. ৭৭২ হিজরী)। তিনি তাঁর একজন মুরীদ বরাবর লিখিত চিঠিতে বলেন—

'হে ভাই! আমরা একজন মহাপ্রতাপশালী সত্তার সামনে রয়েছি। তিনি এমন ক্ষমতাধর যে, তিনি চাইলে জান্নাতকে জাহান্নাম ও আযাবে পরিণত করতে =

প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাঁর কেবল ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়ে যায়। তাঁর কোনও কাজের জন্য আসবাবপত্র জমা করার কোনও প্রয়োজন হয় না।

যদি আগে-পরের সকল জিন-ইনসান জিবরাঈল বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত হয়ে যায়, তাতে তাঁর রাজত্বের ঔজ্জ্বল্য কোনও অংশে বাড়বে না। আবার যদি সকলেই শয়তান বা দাজ্জালে পরিণত হয়, তাতেও তাঁর রাজত্বের শান-শওকত কিছুমাত্র কমবে না। তিনি সর্বাবস্থায় সকলের চেয়ে বড় এবং সকল বাদশার বাদশা। কেউ তাঁর কোনওকিছু বিগড়াতে বা সজ্জিত করতে পারে না[৬০]।

= পারেন এবং জাহান্নামকে জান্নাত ও প্রশান্তিতে রূপান্তর করতে পারেন! তিনি কা'বা থেকে গির্জা তৈরি করতে পারেন এবং গির্জাকে কা'বায় পরিণত করতে পারেন! এমন প্রতাপশালীর সামনে কিভাবে তুমি নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত জীবন যাপন করছ? তাঁর ভয়ে তোমার কলিজা টুকরো টুকরো হয় না কেন? কেন তোমার অন্তর বিগলিত হয় না?

প্রতি মুহূর্তে ভীত ও সতর্ক থাক, যেন আল্লাহর কুদরতি হাত –যা কোনও আসবাবের মুখাপেক্ষী না– গায়েবের পর্দা থেকে প্রকশিত হয়ে সকল মস্তিষ্ককে হতবিহ্বল না করে দেয়! তাঁর দাপট কোনওকিছুর সাথে শর্তযুক্ত নয়, যেমন তাঁর করুণাও কোনওকিছুর সাথে শর্তযুক্ত নয়! যেমন তাঁর দয়া-অনুগ্রহ কখনো কোনও গুনাহগারকে ডেকে ক্ষমার জলে ধৌত করে পূতপবিত্র করে দেয়, এমনকি খোদ ওই ব্যক্তির হৃদয় থেকে করুণার ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং তার বক্ষ উপচে পড়ে, তেমনি তাঁর ক্রোধ কখনো কখনো কোনও নেককার মুত্তাকীকে পাকড়াও করে ত্যাগ ও বিচ্ছেদের ধোঁয়া এবং গজবের আগুন দিয়ে তার চেহারাকে কালো করে দেয়, ফলে বিশ্ববাসীর নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই মহান সত্তা সকল আসবাব-উপকরণ থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী! তিনি কখনো হতভাগার পেট থেকে নবী জন্ম দেন, আবার কখনো নবীর ঔরসে দুর্ভাগা পয়দা করেন'। –নদভী

৬০. সহীহ মুসলিমে (হাদীস ২৫৭৭) হযরত আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন– 'হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো এমন অবস্থানে পৌঁছতে পারবে না যে আমাকে ক্ষতি করবে, আবার এমন অবস্থানেও পৌঁছতে পারবে না যে, আমার উপকার করবে। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি-অন্ত সমস্ত জিন-ইনসান যদি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে পরহেযগার ব্যক্তির ন্যায়=

সুপারিশের দ্বিতীয় সুরত হলো, কোনও স্ত্রী বা যুবরাজ কিংবা বাদশার কোনও প্রিয় মানুষ এই চোরের পক্ষে সুপারিশ করতে দাঁড়িয়ে গেল এবং শাস্তি প্রয়োগে বাঁধা দিল, আর বাদশা ওই সুপারিশকারীর ভালোবাসার সামনে অপারগ হয়ে চোরের অপরাধ ক্ষমা করে দিল– তো এটাকে 'শাফাআতে মুহাব্বত' বলে। অর্থাৎ বাদশা মুহাব্বতের দরুন সুপারিশ কবুল করে নিয়েছে। বাদশা চিন্তা করেছে, একবার রাগ সংবরণ করা ও একজন চোরকে মাফ করে দেওয়া ওই দুঃখ-কষ্টের তুলনায় উত্তম, যা এই প্রেমাস্পদ বেজার হলে আমাকে ভোগ করতে হবে।

আল্লাহর দরবারে এই ধরনের সুপারিশেরও কোনও অবকাশ নেই। কেউ যদি কারও ব্যাপারে বিশ্বাস করে যে, সে আল্লাহর দরবারে এমন সুপারিশকারী হবে, তাহলে সেও তেমনই মুশরিক যেমন প্রথম সুরতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে যতই নেয়ামত দান করুক এবং কাউকে হাবীব (প্রিয়, অর্থাৎ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), কাউকে খলীল (ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম), কাউকে কালীম (আল্লাহর সাথে যিনি সরাসরি কথা বলেন,

---

= অন্তরের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলেও তা আমার রাজত্বে বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি ঘটাবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আদি-অন্ত সকল জিন-ইনসান যদি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মত অন্তরের ধারক হয়, তবে তা আমার রাজত্বে বিন্দুমাত্র হ্রাস ঘটাবে না।
হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি-অন্ত সকল জিন-ইনসান যদি একটি খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আমর নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি প্রত্যেককে তার চাহিদার বস্তু প্রদান করি, তবে তা আমার ভাণ্ডারে অতটুকুর বেশি হ্রাস ঘটাবে না, যতটুকু হ্রাস ঘটিয়ে থাকে সমুদ্রে সুঁই প্রবেশ করালে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের এই সকল আমল গণনা করে রাখছি, অতঃপর আমি তোমাদেরকে এগুলোর পূর্ণ বদলা দেব। অতএব তখন কেউ যদি কোনও কল্যাণ লাভ করে তাহলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর কেউ যদি অন্যকিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পায়, তাহলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে'।
–নদভী

অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম) ও কাউকে রূহুল্লাহ (আল্লাহ প্রদত্ত রূহ অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম) উপাধি দান করুক; আবার কাউকে রাসূলুন কারীম, মাকীন, রূহুল কুদস এবং রূহুল আমীন[৬১] বলুক, আখের মালিক মালিকই এবং গোলাম গোলামই। গোলাম কখনো গোলামীর স্তর থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না এবং গোলামীর সীমানা থেকে আগে বাড়তে পারে না। যেমন তাঁর রহমতে সর্বদা আনন্দচিত্তে তাঁর সামনে মাথা অবনত করে রাখে, তেমনি তাঁর ভয়ে সর্বদা কম্পমান থাকে[৬২]।

ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য সুপারিশ

সুপারিশের তৃতীয় সুরত হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু সে পেশাদার চোর না এবং সর্বদা

---

৬১. এগুলো কুরআনে বর্ণিত হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর বিভিন্ন উপাধি। দ্রষ্টব্য– সূরা তাকবীর, ১৯-২১; সূরা বাকারা, ৮৭; সূরা শুআরা, ১৯৩-১৯৪। –অনুবাদক

৬২. মহান বুযুর্গ আরেফ, শাইখ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরী রহ. তার শাগরেদদের নিটক প্রেরিত এক চিঠিতে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব-বড়ত্ব ও মাখলুকের উপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্যের এমন বিবরণ দিয়েছেন, যা দ্বারা অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে এবং শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। তিনি বলেন–

‘তিনি যা ইচ্ছা করেন, এতে কারও মরা-বাঁচার পরোয়া করেন না। দেখ, মরুভূমিতে একজন তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছে এবং (আফসোস করে) বলছে– আমার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে অথচ আমি তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছি, কিন্তু পানির একটি ফোটাও আমার ভাগ্যে জুটছে না! তখন তাকে সম্বোধন করে গায়েব থেকে আওয়াজ আসে– আমি হাজারো সিদ্দীককে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ানক জঙ্গলে কিংবা অনুর্বর শুকনো মুরুভূমিতে নিয়ে আসি এবং তাদের সকলকে আমার কুদরতের তরবারি দ্বারা হত্যা করি, যেন কিছু কাক-শকুন তাদের চোখ ও গাল থেকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে! কেউ যদি অভিযোগ করতে উদ্যত হয়, তবে আমি তার জিহ্বার উপর মহর এঁটে দিই এবং বলি– কোনও কাজের জন্য কারও কাছে তাঁর জবাবদিহিতা করতে হয় না। এই পাখিরাও আমার, সিদ্দীকীনরাও আমার। তাহলে এই অনধিকার চর্চাকারী তৃতীয় ব্যক্তি কে, যে আমার কাজের উপর আপত্তি করে?’। –নদভী

চুরি করে না। কিন্তু প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে চুরি করে ফেলেছে। সেজন্য সে লজ্জিত এবং সর্বদা ভীত। সে বাদশার আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল এবং নিজেকে অপরাধী ও শাস্তির উপযুক্ত মনে করে। সে বাদশার কাছ থেকে পলায়ন করে কোনও আমীর বা মন্ত্রীর আশ্রয় তালাশ করে না। বাদশার বিপরীতে অন্য কারও সাহায্য কামনা করে না বরং রাতদিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করে যে, তার ব্যাপারে বাদশা কী ফায়সালা করে? তখন তার এই অবস্থা দেখে বাদশার মনে মায়া জাগে।

কিন্তু আইনের প্রতি খেয়াল করে কোনও কারণ ছাড়া মাফও করতে পারে না, অন্যথায় আইনের প্রতি মানুষের মনে অশ্রদ্ধা তৈরি হতে পারে। তাই বাদশার ইশারায় কোনও আমীর বা মন্ত্রী ওই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে। তখন বাদশা এই আমীরের সম্মানার্থে তার সুপারিশ গ্রহণ করার বাহানায় চোরের অপরাধকে মার্জনা করে দেয়।

তো এখানে আমীর সাহেব এই চোরের জন্য এই কারণে সুপারিশ করেনি যে, তার সাথে কোনও আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব আছে, কিংবা সে তাকে কোনও সাহায্য করেছিল। বরং সে কেবল বাদশার মর্জির কারণে সুপারিশ করেছে। কারণ সে তো বাদশার আমীর, চোরদের পৃষ্ঠপোষক নয় যে, সে চোরদের সহযোগী হয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। কারণ তাহলে তো সে নিজেও চোর সাব্যস্ত হবে। এটাকে শাফাআত বিল-ইযন বলে। অর্থাৎ এই সুপারিশ স্বয়ং মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে।

আল্লাহর দরবারে কেবল এই ধরনের সুপারিশ চলতে পারে এবং কুরআন-হাদীসে নবী-ওলীদের যে সুপারিশের কথা আছে, তা দ্বারা এই সুপারিশই উদ্দেশ্য।

সুতরাং প্রত্যেক বান্দার কর্তব্য হলো, সর্বদা আল্লাহকেই ডাকবে; তাঁকেই ভয় করবে; তাঁর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করবে; কেবল তাঁর সামনেই নিজের গুনাহের স্বীকারোক্তি প্রদান করবে; তাঁকেই নিজের মালিক ও সাহয্যকারী মনে করবে।

আল্লাহকে ছাড়া কাউকে নিজের আশ্রয়স্থল মনে করবে না; অন্য কারও সাহায্যের উপর ভরসা করবে না। কেননা তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল প্রতিপালক, সকল মুসিবত নিজ অনুগ্রহে দূর করে দেবেন এবং নিজ দয়ায় সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি যাকে চাবেন নিজ হুকুমে তার জন্য সুপারিশকারী নিযুক্ত করবেন।

মোটকথা, যেমন নিজের অন্য সকল প্রয়োজনকে তাঁর কাছে সোপর্দ করা উচিত, তেমনি এই প্রয়োজনও তাঁরই এখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া উচিত যে, তিনি যাকে ইচ্ছা আমাদের সুপারিশকারী নির্বাচন করবেন।

এমনটি কখনোই উচিত নয় যে, কারও সাহায্যের উপর ভরসা করবে এবং সাহায্যের জন্য তাকে ডাকবে। তাকে সাহায্যকারী মনে করে আসল মালিককেই ভুলে যাবে এবং তাঁর আহকাম ও শরীয়তকে অবমূল্যায়ন করে ওই কল্পিত সাহায্যকারীদের পন্থা ও রসম-রেওয়াজকে প্রাধান্য দেবে!

এগুলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট কথা এবং সকল নবী-ওলীরা এগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট। তারা কখনোই এমন লোকদের সুপারিশকারী হবেন না। বরং রাগান্বিত হবেন এবং উল্টো তাদের দুশমন হবেন।

কেননা তাদের বুযুর্গির মূল কথা তো এটাই যে, তারা স্ত্রী-সন্তান, শাগরেদ-মুরীদ, চাকর-নোকর ও বন্ধু-বান্ধবের সন্তুষ্টির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতেন। আর যখন এসব নিকটজনেরা আল্লাহর সন্তুষ্টির খেলাফ কাজ করত, তখন তারা ওই সকল বুযুর্গদের দুশমন হয়ে যেত।

তাহলে গাইরুল্লাহকে আহ্বানকারী এই সকল লোক এমন কী হয়ে গেছে যে, বড় বড় লোক (অর্থাৎ নবী-ওলীরা) নিজেদের মর্জির খেলাফ তাদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহর দরবারে ঝগড়া করবেন? বরং ‘আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্যই দুশমনি’– এটাই তো তাদের শান! ফলে যাকে জাহান্নামে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, তারা তাকে আরও দু'চারটি ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকবেন!

দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের বিপরীতে, আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ হয়ে সহযোগিতা চাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلٰى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন– একদিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন– ‘হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি– তুমি আল্লাহর বিধি-নিষেধ রক্ষা করবে, তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর হুকুম-আহকামের প্রতি লক্ষ রাখবে, তাহলে আল্লাহকে তোমার কাছে পাবে। তোমার কিছু চাইতে হলে কেবল আল্লাহর নিকটই চাবে। আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে কেবল আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে।

জেনে রাখ! যদি পুরো জাতিও তোমার উপকারের জন্য একত্রিত হয় তাহলে তারা ততটুকুর বেশি কোনও উপকার করতে পারবে না, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আবার যদি পুরো জাতি মিলে তোমার কোনও ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা ততটুকুর বেশি ক্ষতি পারবে না, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজ শুকিয়ে গেছে’।[৬৩]

---

[৬৩] জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। –অনুবাদক

অর্থাৎ সকল বাদশার বাদশা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অন্যান্য বাদশাদের মত এমন দাম্ভিক নয় যে, কোনও প্রজা যত উত্তম পন্থায়ই দরখাস্ত পেশ করুক, দাম্ভিকতার কারণে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এ জন্য প্রজারা অন্যান্য আমীরদের দ্বারস্থ হয় এবং তাদের মাধ্যম গ্রহণ করে, যেন তাদের খাতিরে দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা তো অত্যন্ত দয়ালু ও মহান। তাঁর দরবারে কারও ওকালতির প্রয়োজন হয় না। তাঁকে স্মরণ করলে তিনি নিজেই বান্দাকে স্মরণ করেন, কেউ সুপারিশ করুক বা না করুক। অনুরূপভাবে তিনি সবকিছু থেকে পবিত্র এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে। অন্যান্য বাদশাদের মত তাঁর এমন দরবার নেই যেখানে প্রজাসাধারণ প্রবেশ করতে পারে না। ফলে আমীর ও মন্ত্রীরাই প্রজাদেরকে শাসন করে এবং প্রজারা তাদেরকে মানতে ও তাদের দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়।

বরং আল্লাহ তাআলা বান্দাদের একেবারে নিকটবর্তী। কোনও সাধারণ বান্দাও যদি তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে, তাহলে সে তাঁকে তার সামনেই পাবে। নিজের গাফিলতি ছাড়া অন্য কোনও পর্দা এখানে নেই। যারাই তাঁর কাছ থেকে দূরে আছে, তারা নিজেদের গাফিলতির কারণেই দূরে আছে। তিনি তো সকলেরই নিকটবর্তী।

এরপরও যে ব্যক্তি কোনও নবী বা পীরকে ডাকে, যেন তারা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়, সে মূলত বোঝে না যে, নবী-পীর তো তার থেকে দূরে! অথচ আল্লাহ্ তাআলা খুবই কাছে।

তার উদাহরণ হলো, একজন প্রজা বাদশার কাছে একান্তে বসে আছে এবং বাদশা ফরিয়াদ শোনার জন্য তার প্রতি মনোযোগী হয়ে আছে, কিন্তু তারপরও ওই প্রজা কোনও আমীর বা মন্ত্রীকে দূর থেকে ডেকে বলে– আপনি আমার পক্ষ থেকে বাদশার কাছে অমুক দরখাস্তটি পেশ করুন! আসলে ওই প্রজা হয়তো অন্ধ কিংবা পাগল।

এই হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন– নিজের সকল প্রয়োজন কেবল আল্লাহর নিকট চাও এবং সকল বিপদাপদে কেবল তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর সুনিশ্চিত জেনে নাও, তাকদীরের লিখন কখনো মিটবার নয়। তাই

পুরো দুনিয়ার বড়-ছোট সবাই মিলেও যদি কোনও উপকার বা ক্ষতি করতে চায়, তবুও আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তারচেয়ে বেশিকিছু করতে পারবে না।

আল্লাহর নেক বান্দারা আল্লাহর নিকট দুআ ও প্রার্থনা ছাড়া কোনওকিছুর ক্ষমতা রাখে না

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, যে সকল লোক বলে, ওলীদেরকে আল্লাহ তাআলা এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তারা তাকদীর পরিবর্তন করতে পারে, ফলে যার তাকদীরে সন্তান নেই, তাকে সন্তান দিতে পারে, যার হায়াত শেষ হয়ে গেছে, তার হায়াত বাড়িয়ে দিতে পারে– তাদের এসব কথা সম্পূর্ণ গলদ।

বরং এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বান্দারই কিছু দুআ কবুল করে নেন। আর নবী-ওলীদের অধিকাংশ দুআ কবুল করেন। কিন্তু দুআর তাওফীক দেওয়া তাঁরই এখতিয়ারে এবং দুআ কবুল করাও তাঁরই এখতিয়ারে। দুআ করা ও উদ্দেশ্য হাসেল হওয়া, উভয়টি তাকদীরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাকদীরের বাইরে কোনওকিছু দুনিয়াতে ঘটতে পারে না বা কেউ করতে পারে না।

ছোট-বড়, নবী-ওলী– সকল বান্দা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর নিকট দুআ করার চেয়ে বেশিকিছুর ক্ষমতা রাখে না। অতঃপর তিনি স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী মালিক, চাইলে নিজ অনুগ্রহে সেই দুআ কবুল করবেন, কিংবা নিজ হেকমতে তা কবুল করবেন না।

তাওহীদবাদী মুমিন হন আত্মনিয়ন্ত্রিত ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আর দুর্বলবিশ্বাসী হয়ে থাকে পেরেশান ও বিক্ষিপ্ত চিন্তার অধিকারী

সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً، فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا، لَمْ يُبَالِ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ، كَفَاهُ الشُّعَبَ.

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– (প্রবৃত্তির) প্রত্যেকটি উপত্যকায় আদম সন্তানের অন্তরের একটি পথ আছে। যে তার অন্তরকে এই সকল পথের অনুগামী করে, আল্লাহ তাআলা তাকে যে কোনও উপত্যকায় ধ্বংস করতে কোনও পরোয়া করবেন না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, আল্লাহ তার জন্য ওই সকল পথ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবেন'।[৬৪]

অর্থাৎ যখন মানুষের কোনওকিছুর প্রয়োজন হয় কিংবা কোন বিপদ সামনে আসে, তখন তার মন বিভিন্ন দিকে ছুটতে থাকে– অমুক নবীকে ডাকি, অমুক ইমামের কাছে সাহায্য চাই, অমুক পীর বা শহীদের নামে মানত করি, অমুক পরী বা জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হই, কিংবা অমুক মৌলভীর মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করি ইত্যাদি।

তো যে ব্যক্তি এই সকল চিন্তা-কল্পনার পিছনে পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে কবুলিয়াতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং তাকে খাঁটি বান্দাদের দল থেকে বের করে দেন। ফলে সে খোদায়ী হেদায়াত ও তরবিয়তের পথ থেকে ছিটকে পড়ে এবং ওই সকল কল্পনার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ বেদ্বীন-নাস্তিক হয়ে যায়, কেউ মুশরিক হয়ে যায়।

---

[৬৪] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪১৬৬। আল্লামা বূসীরী বলেন– হাদীসটির সনদ যঈফ। –মিসবাহুয যুজাজাহ, ৪/২২৭।

তবে হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনায় সহীহ সূত্রে এর কাছাকাছি মর্মের একটি হাদীস রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'যে তার সকল চিন্তাকে এক চিন্তায় পরিণত করে নেয় অর্থাৎ পরকালের চিন্তা, আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়া-আখেরাতের সকল চিন্তা-পেরেশানীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং তার অন্তরে অনপেক্ষতা ঢেলে দেন। আর যার চিন্তাসমূহ বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়, সে দুনিয়ার যে উপত্যকায় ধ্বংস হোক তাতে আল্লাহর কোনও পরোয়া নেই'।

–আয-যুহদ, ইবনে আবী আসেম, হাদীস ১৬৬; শাইখ শুআইব আলআরনাউত কৃত সুনানে ইবনে মাজাহর তাখরীজ, ২৫৭ নং হাদীস। –অনুবাদক

আর যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং অন্য কোনও কল্পনার পিছনে না পড়ে তাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর মাকবূল বান্দাদের মধ্যে গণ্য করেন এবং তার জন্য হেদায়েতের রাস্তা খুলে দেন। তার অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা এমন প্রশান্তি দান করেন, যা কল্পনার পিছনে পড়া ব্যক্তিদের কখনো অর্জন হয় না।

তাছাড়া যার তাকদীরে যতটুকু লিখা আছে, ততটুকু লাভ হবেই। কিন্তু যারা কল্পনার পিছনে ছোটে তারা মাঝখানে শুধু শুধু কষ্ট পায়, আর তাওয়াক্কুলকারীরা নিশ্চিন্তে পেয়ে যায়।

ছোট-বড় সকল বিষয়ে আল্লাহর দ্বারস্থ হওয়া যায়; দুনিয়ার রাজা-বাদশারা যেভাবে দেশ পরিচালনা করে তিনি সেভাবে করেন না

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتّٰى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ.

হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজের সকল প্রয়োজন তার রবের নিকট চায়। এমনটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সেটাও চাবে'।[৬৫]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে দুনিয়ার বাদশাদের মত মনে করো না, যারা বড় বড় কাজ নিজেরা করে আর ছোট ছোট কাজ চাকর-নোকরদের উপর ন্যস্ত করে। আর তাই ছোট কাজে লোকদেরকে তাদের দ্বারস্থ হতে হয়!

কিন্তু আল্লাহর দরবার এমন নয়। তিনি এমন ক্ষমতাবান যে, এক মুহূর্তে ছোট-বড় কোটি কাজ সম্পন্ন করতে পারেন এবং তাঁর রাজত্বে

---

[৬৫] জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬০৪/৮; সহীহ ইবনে হিব্বান (শাইখ শুআইব-এর তাহকীককৃত), হাদীস ৮৬৬। –অনুবাদক

কারও কোনও ক্ষমতা চলে না। সুতরাং ছোট বস্তুও তাঁর নিকটই চাওয়া উচিত। অন্য কেউ ছোট-বড় কোনও বস্তুই দিতে সক্ষম নয়।

বংশ ও আত্মীয়তার উপর নির্ভর করে আমলবিমুখ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর আত্মীয়দের সতর্কীকরণ

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوْا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ هَاشِمٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا.

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন– যখন সূরা শুআরার এই আয়াত নাযিল হলো যে, 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন', তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশকে ডাকলেন। তারা একত্রিত হলো। তখন তিনি তাদেরকে আম ও খাস–দুইভাবেই সম্বোধন করলেন। বললেন–

'হে কা'ব বিন লুআইয়্যের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা কর। হে মুররা বিন কা'বের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা কর। হে আবদে শামসের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা কর। হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা কর। হে হাশেমের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে

নিজেদের রক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা কর। হে ফাতেমা! তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কারণ আল্লাহর বিপরীতে আমি তোমাদের কোনও উপকার করার সামর্থ্য রাখি না। তবে আমার সাথে তোমাদের যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, (দুনিয়াতে) তা আমি অটুট রাখব'।[৬৬]

অর্থাৎ যেসব লোক কোনও বুযুর্গের আত্মীয় হয়, তারা ওই বুযুর্গের সাহায্যের উপর ভরসা করে থাকে এবং এই আত্মীয়তার অহংকার আল্লাহর ভয় কমিয়ে দেয়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়েছেন– নিজের আত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।

সুতরাং তিনি নিজের কন্যা ফাতেমা পর্যন্ত সকলকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে, আত্মীয়তার হক আদায় করা এমন জিনিসের ক্ষেত্রেই কেবল হতে পারে, যা নিজের এখতিয়ারে আছে। অতএব এই যে আমার সম্পদ আছে, তাতে আমার কোনও কার্পণ্য নেই। কিন্তু আল্লাহর বিষয় আমার এখতিয়ারে নেই। সেখানে আমি কারও সাহায্য করতে পারব না, কারও উকিল হতে পারব না। সেখানকার লেনদেন প্রত্যেকেই নিজেরটা নিজে ঠিক করতে হবে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সকল উপায় গ্রহণ করতে হবে।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, কোনও বুযুর্গের সাথে শুধু আত্মীয়তা আল্লাহর নিকট কোনও কাজে আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে সাফ না করে নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও কাজ হবে না।

---

[৬৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০৪; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৪৮। –অনুবাদক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক-এর খণ্ডন

ইবাদত বলা হয় ওই সকল কাজকে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা নিজের তাযীমের জন্য বান্দাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে যে, কুরআন-হাদীসে আল্লাহর তাযীমের জন্য কোন কোন কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেন অন্য কারও জন্য সেগুলো না করা হয়। অন্যথায় শিরক হবে।

শিরক ত্যাগ করে খাঁটি তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার দাওয়াত আদিকাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ

إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

‘আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালাম যে, আমি তোমাদের জন্য এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সতর্ককারী– যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির ভয় করি’।[৬৭]

অর্থাৎ মুসলমান এবং কাফেরের সংঘাত হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর কাল থেকে শুরু হয়েছে এবং তখন থেকেই আল্লাহর মাকবুল বান্দারা (অর্থাৎ নবীগণ) এ কথা বলে আসছেন যে, আল্লাহর তাযীম অন্য কারও মত করো না। আল্লাহর তাযীমের জন্য যে কাজ কর, তা অন্য কারও জন্য করো না।

---

[৬৭] সূরা হূদ, ২৫-২৬

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনও ধরনের সিজদা করা জায়িয নয়

আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾

‘তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন– যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁর ইবাদত করে থাক’।[৬৮]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দা বনতে চায়, সে তাঁকেই সিজদা করবে। কোনও চন্দ্র-সূর্যকে সে সিজদা করবে না।

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, আমাদের দ্বীনে সিজদা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হক। সুতরাং কোনও মাখলুককে সিজদা করা যাবে না। আর মাখলুক হওয়ার ক্ষেত্রে চন্দ্র-সূর্য এবং নবী-ওলী– সকলেই বরাবর।

অতএব কেউ যদি বলে, পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে কোনও কোনও মাখলুককে সিজদা করা হত, যেমন– ফেরেশতাগণ আদমকে সিজদা করেছে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফকে সিজদা করেছে, তাই আমরাও যদি কোনও বুযুর্গকে সিজদা করি তাতে কোনও সমস্যা নেই– তাহলে এই কথা সম্পূর্ণ গলদ[৬৯]।

---

[৬৮] সূরা হা-মীম সাজদা, ৩৭

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এটি সিজদার আয়াত, যে ব্যক্তি এ আয়াত তেলাওয়াত করবে বা কাউকে তেলাওয়াত করতে শোনবে, একটি সিজদা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। পৃথক পৃথক বৈঠকে যতবার এ আয়াতটি পাঠ করা হবে, ততবার একটি সিজদা ওয়াজিব হবে। –সম্পাদক

[৬৯] পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উলামা-মাশাইখ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ ছাড়া কারও জন্য সিজদা করা জায়িয নেই, চাই তা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হোক কিংবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য হোক। তাছাড়া এ বিষয়ে অসংখ্য সহীহ হাদীস =

পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে অনেককিছুই বৈধ ছিল, যা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম-এর সময়ে মানুষ নিজের বোনকে বিয়ে করত, তাহলে কি এসব লোকেরা নিজেদের বোনকে বিয়ে করবে?!

আসল কথা হলো, বান্দার কর্তব্য আল্লাহর হুকুম মান্য করা। তিনি যখন যে হুকুম দেবেন তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করা এবং কোনও ধরনের

= তো আছেই। হানাফী মাযহাবের ফকীহ ইমামগণ সম্মানার্থে সিজদাকে সুস্পষ্টরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ এরূপ সিজদাকারীকে কাফের ফাতওয়া দিয়েছেন।

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. 'মাবসূত' (২৪/১৩০) গ্রন্থে বলেন– যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে সম্মানার্থে সিজদা করল সে কাফের হয়ে গেল।

আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. 'রদ্দুল মুহ্তার' (৫/১৭৮) গ্রন্থে বলেন– সিজদার মাধ্যমে শর্তাতীতভাবে কাফের হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. আল-ই'লাম বিকাওয়াতিইল ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন– অনেক মূর্খরা পীর-মাশাইখদের সামনে যে সিজদা করে থাকে, তা সর্বাবস্থায় অকাট্য হারাম, চাই তা কিবলামুখী হয়ে করুক কিংবা অন্যমুখী হয়ে, আল্লাহর নিয়তে করুক বা অন্য নিয়তে!

শাইখ আহমাদ রেজা খান বেরেলভী (১৩৪০ হিজরী) 'আয্-যুবদাতুয্ যাকিয়্যাহ' নামক পুস্তিকায় সম্মানার্থে কৃত সিজদা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ১৫০টি ফিকহী রেফারেন্স একত্র করেছেন, তা দেখা যেতে পারে।

ইমাম আহমাদ ইবনে আবদুল আহাদ সারহিন্দি মুজাদ্দেদে আলফে সানী (১০৩৪ হিজরী) রহ.-এর নিকট একবার সংবাদ পৌছল যে, তাঁর এক মুরীদকে তার ভক্তরা সম্মানার্থে সিজদা করে, কিন্তু সে তাদেরকে শক্তভাবে বারণ করে না। তখন মুজাদ্দেদে আলফে সানী রহ. ওই মুরীদের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে বলেন– হে ভাই! সিজদার অর্থ হলো জমিনে কপাল রাখা। এই সিজদা মানুষের চূড়ান্ত পর্যায়ের তুচ্ছতা, মুখাপেক্ষিতা, অক্ষমতা ও বিনয়কে প্রকাশ করে। তাই এই পর্যায়ের তুচ্ছতা ও বিনয়কে আল্লাহর ইবাদতের সাথে খাস করা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য এর অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মাকতুবাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী, ৯২/২ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নুমান বরাবর চিঠি। –নদভী

তর্ক না করা যে, পূর্ববর্তী লোকদের উপর তো এই হুকুম ছিল না, তাহলে আমাদের উপর এই হুকুম কেন আরোপ করা হলো? কেননা এরূপ তর্ক দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যায়।

এর উদাহরণ হলো, একজন বাদশা তার রাজত্বে একটি সময় পর্যন্ত এক হুকুম জারি রেখেছে, অতঃপর সেই হুকুমের পরিবর্তে আরেক হুকুম জারি করেছে। এখন যদি কেউ বলে, আমি পূর্বের হুকুম অনুযায়ী চলব, নতুন হুকুম মানি না, তাহলে সে বিদ্রোহী সাব্যস্ত হবে।

নেককার-বুযুর্গদের ক্ষেত্রে লোকদের অতিভক্তি ও গোমরাহী

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝۱۸ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝۱۹ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ۝۲۰

'এবং (আমার নিকট ওহী এসেছে যে,) সিজদাসমূহ আল্লাহরই প্রাপ্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করো না। এবং এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁর ইবাদত করার জন্য দাঁড়াল, তারা তার উপর যেন ভেঙ্গে পড়ছিল। বলে দাও, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালকের ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক স্থির করি না'।[৭০]

অর্থাৎ যখন আল্লাহর কোনও বান্দা খাঁটি দিলে তাঁকে ডাকে, তখন বোকা লোকেরা মনে করে, ইনি তো বড় বুযুর্গ বনে গেছেন। উনি যাকে চান দিতে পারেন, যার থেকে চান ছিনিয়ে নিতে পারেন। আর এই আশায় তারা তার নিকট ভীড় জমায়।

তাই ওই বান্দার কর্তব্য হলো সত্য কথা বলে দেওয়া যে, বিপদের সময় ডাকা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হক এবং লাভ-ক্ষতির আশা একমাত্র তাঁর কাছেই করা উচিত। অন্য কারও কাছে এসব কামনা করা শিরক এবং আমি শরীক ও শিরক– উভয়টিকে অপছন্দ করি।

---

[৭০] সূরা জিন, ১৮-২০

অতএব কেউ যদি চায় যে, এরূপ আশা আমার কাছে করবে আর আমি সেটা পছন্দ করব– তা কখনোই সম্ভব নয়।

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, কোনও বুযুর্গের তাযীমে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা, তাকে ডাকা এবং তার নাম জপতে থাকা ওই সকল কাজের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ তাআলা স্বীয় তাযীমের জন্য খাস করেছেন। তাই অন্য কারও জন্য এগুলো করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি ও চূড়ান্ত স্তরের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও আত্মবিস্মৃতির নিদর্শনাবলি একমাত্র বাইতুল্লাহ ও হারাম শরীফের জন্য প্রযোজ্য

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ اَذِّنۡ فِی النَّاسِ بِالۡحَجِّ یَاۡتُوۡكَ رِجَالًا وَّ عَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ یَّاۡتِیۡنَ مِنۡ كُلِّ فَجٍّ
عَمِیۡقٍ (٢٧) لِّیَشۡهَدُوۡا مَنَافِعَ لَهُمۡ وَ یَذۡكُرُوا اسۡمَ اللّٰهِ فِیۡۤ اَیَّامٍ مَّعۡلُوۡمٰتٍ عَلٰی مَا
رَزَقَهُمۡ مِّنۡۢ بَهِیۡمَةِ الۡاَنۡعَامِ ۚ فَكُلُوۡا مِنۡهَا وَ اَطۡعِمُوا الۡبَآئِسَ الۡفَقِیۡرَ (٢٨) ثُمَّ لۡیَقۡضُوۡا
تَفَثَهُمۡ وَ لۡیُوۡفُوۡا نُذُوۡرَهُمۡ وَ لۡیَطَّوَّفُوۡا بِالۡبَیۡتِ الۡعَتِیۡقِ (٢٩)

‘এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদযোগে এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমকারী উঠের পিঠে সওয়ার হয়ে যেগুলো (দীর্ঘ সফরের কারণে) রোগা হয়ে গেছে। যাতে তারা তাদের জন্য স্থাপিত কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেই সকল পশুতে যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং (হে মুসলমান!) সেই পশুগুলি থেকে তোমরা নিজেরাও খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও। অতঃপর (যারা হজ্জ করে) তারা যেন তাদের মলিনতা দূর করে ও নিজেদের মানত পূরণ করে এবং আতীক গৃহের (অর্থাৎ বাইতুল্লাহর) তাওয়াফ করে’।[৭১]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা স্বীয় তাযীমের জন্য কিছু জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন– কা‘বা, আরাফা, মুযদালিফা, মিনা, সাফা-

---

[৭১] সূরা হজ্জ, ২৭-২৯

মারওয়া, মাকামে ইবরাহীম, পুরো মসজিদে হারাম, বরং পুরো হারামের এলাকা ও মক্কা মুকার্‌রামা। এবং তিনি মানুষের অন্তরে এসব জায়গায় যাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে সর্বদিক থেকে পায়ে হেঁটে এবং সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসব জায়গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং সফরের কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে মলিন বদনে সেখানে উপস্থিত হয়।

তারা আল্লাহর নামে সেখানে পশু জবাই করে এবং নিজেদের মানত আদায় করে। ওই গৃহের তাওয়াফ করে এবং প্রভুর প্রতি অন্তরের পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধা সেখানে নিবেদন করে। কেউ চৌকাঠে চুমু খায়। কেউ দরজার সামনে দুআ করে। কেউ গেলাফ ধরে কাকুতি-মিনতি করে। কেউ এখানে ইতিকাফের নিয়তে অবস্থান করে রাতদিন আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকে। কেউ ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে পবিত্র কা'বার দর্শন নিতে থাকে।

মোটকথা, এই জাতীয় কাজ তারা একমাত্র আল্লাহর তাযীম ও সম্মানে করে থাকে। আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ লাভ হয়।

সুতরাং এই জাতীয় কাজ অন্য কারও সম্মানার্থে করা যাবে না। কোনও মাযার বা বুযুর্গের আস্তানার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে রওয়ানা হওয়া এবং সফরের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মলিন বদনে সেখানে উপস্থিত হওয়া; সেখানে গিয়ে প্রাণী উৎসর্গ করা এবং মানত পূরণ করা; কোনও মাযার বা গৃহের তাওয়াফ করা; তার আশপাশের জঙ্গলের প্রতি বিশেষ আদব প্রদর্শন করা– শিকার না করা, বৃক্ষ না কাটা ও ঘাস না উপড়ানো ইত্যাদি, এবং এসবের মাধ্যমে দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করা[৭২]– এই সব শিরকি কাজ। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। কেননা এসব একমাত্র আল্লাহর জন্য করা যায়। কোনও মাখলুক এগুলোর উপযুক্ত নয়।

---

৭২. যেমনটি হিন্দুস্তান ও ইরানের অনেক মূর্খ-সীমালঙ্ঘনকারীরা বুযুর্গদের মাযারে গিয়ে করে থাকে। তারা মাযারে গিয়ে এমন সব আদব ও বিধি-নিষেধ রক্ষা করে থাকে, যেগুলো হজ্জের আদব ও বিধি-নিষেধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বরং সূক্ষ্মতা, সতর্কতা ও স্থিরচিত্ততার দিক থেকে হজ্জের চেয়েও অগ্রসর। –নদভী

বুযুর্গদের জন্য প্রাণী উৎসর্গ করা, সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নৈকট্য লাভ করা এবং তাদের জন্য এসব প্রাণী মানত ও জবাই করা– সবই হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

‘অথবা যদি হয় এমন গুনাহের বস্তু, যাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য যবাহ করা হয়েছে (তা হারাম)’।[৭৩]

অর্থাৎ শূকর, রক্ত এবং মৃত প্রাণী যেমন নাপাক ও হারাম, তেমনি ওই প্রাণীও নাপাক ও হারাম যে প্রাণী গুনাহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করা হয়।[৭৪]

---

[৭৩] সূরা আনআম, ১৪৫

[৭৪] সকল মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফকীহগণ এবং গ্রহণযোগ্য সকল উলামায়ে কেরাম এই কাজটিকে অত্যন্ত শক্তভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাঁদের অনেকে এই ধরনের প্রাণীকে মৃত ও জবাইহীন প্রাণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাফসীর ও আহকামুল কুরআন বিষয়ক গ্রন্থে সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ এর তাফসীর এবং চারো মাযহাবের ফিকহের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

এ বিষয়ে বিশদ ও অত্যন্ত সারগর্ভ বিশ্লেষণ পেশ করেছেন শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে।

আর ফুকাহায়ে কেরাম গাইরুল্লাহর সম্মানার্থে পশু জবাই করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি কোনও আমীর বা বড় ব্যক্তির আগমনে তার নৈকট্য লাভের জন্য জবাইকৃত পশুকে হারাম ঘোষণা করেছেন। ‘দুররে মুখতার’ গ্রন্থে (৫/১৯৬) আছে– ‘কোনও আমীর বা বড় ব্যক্তির আগমনে যে পশু জবাই করা হয়, তা হারাম। কেননা তা গাইরুল্লাহর জন্য জবাই করা হয়েছে। যদিও জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হোক না কেন’।

এ বিষয়ে সকল বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম একমত। ইমাম আহমাদ ইবনে আবদুল আহাদ সারহেন্দী মুজাদ্দেদে আলফে সানী রহ. তাঁর এক মুরীদের নিকট প্রেরিত চিঠিতে বলেন– অনেক মূর্খ লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে যে, তারা তাদের পীর ও অন্যান্য ওলীদের নামে প্রাণী মানত করে এবং সেগুলো তাদের মাযারে নিয়ে জবাই করে। অথচ ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে শিরক =

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, কোনও প্রাণীকে মাখলুকের নামে নির্ধারণ করা যাবে না। করলে সেটা নাপাক ও হারাম গণ্য হবে। এই আয়াতে এমন কোনও কথা নেই যে, ওই প্রাণী জবাই করার সময় কোনও মাখলুকের নাম নিলে কেবল হারাম হবে[৭৫]; বরং এইটুকু বলা হয়েছে যে, কোনও প্রাণী যদি কোনও মাখলুকের নামে ঘোষণা করা হয়, যেমন– এটা শাইখ আহমাদ কাবীরের[৭৬] গাভী; ওটা শাইখ সাদ্দুর[৭৭] ষাঁড় ইত্যাদি, তাহলে তা হারাম হয়ে যায়।

সুতরাং কোনও প্রাণীকে -চাই মুরগী হোক বা উট- যদি নবী-ওলী, বাপ-দাদা, ভূত-পরী– কোনও মাখলুকের নামে ঘোষণা করা হয়, তাহলে তা সবই হারাম ও নাপাক হয়ে যাবে এবং এরূপ কাজ যে করবে, তার উপর শিরক সাব্যস্ত হবে।

অসংখ্য অংশীদার ও নামসর্বস্ব দেবদেবী

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٣٩
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا

= গণ্য করেছেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়ে এর থেকে সতর্ক করেছেন। তাঁরা এসব পশু জবাই করাকে ওই সকল প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, মুশরিকরা যেগুলোকে জিনদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাদের ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য জবাই করত। মাকতুব, ৪১/৩৫। –নদভী

[৭৫] দেখুন– শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ.-এর 'ফাতহুল আযীয' (পৃ. ৪১৫) গ্রন্থে সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ এর তাফসীর। সেখানে বড় বড় ফুকাহা ও মুফাস্সীরদের উদ্ধৃতিসহ এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা পাবেন। –নদভী

[৭৬] প্রবল ধারণা হলো, এর দ্বারা রেফাঈ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম সাইয়্যেদ আহমাদ রেফাঈ (৫৭৮ হিজরী) উদ্দেশ্য। –নদভী

[৭৭] এটা একটা কাল্পনিক চরিত্র, যার কোনও অস্তিত্ব নেই। সাধারণত নারীরাই তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তার জন্য মানত করে। দেখুন– নূরুল লুগাত, ৩/৪৬২; ফারহাঙ্গে আসিফিয়্যাহ, ৩/১৯৮। –নদভী

مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

'হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন-ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না সেই এক আল্লাহ্, যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী? তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছ। আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলীল নাযিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না'।[৭৮]

অর্থাৎ প্রথমত, একজন গোলামের জন্য একাধিক মনিব থাকাটা অনেক ক্ষতিকর। তাই এমন একজন ক্ষমতাবান মালিক থাকা দরকার, যে একাই তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেবে এবং তার সকল সমস্যার সমাধান করবে।

দ্বিতীয়ত, এসব মালিকদের কোনও বাস্তবতা নেই। আসলে তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। বরং লোকেরা কাল্পনিকভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে যে, বৃষ্টি বর্ষণ করা একজনের অধীনে, ফসল উৎপন্ন করা আরেকজনের অধীনে, সন্তান দেওয়া আরেকজনের কাজ আর সুস্থতা দেওয়া আরেকজনের দায়িত্বে।

অতঃপর তারা নিজেরাই এসব কাল্পনিক প্রভুদের নাম ঠিক্ করে নিয়েছে যে, অমুক কাজ আঞ্জামদাতার নাম এই, অমুক কাজেরটা এই। তারপর তারা এদেরকে মান্য করে এবং ওই সকল কাজের সময় এদেরকে ডাকে। এভাবেই একটা সময়ে এগুলো রেওয়াজে পরিণত হয়। অথচ এসব প্রভুরা কেবল তাদের কল্পনায় রয়েছে, বাস্তবে তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই।[৭৯]

---

[৭৮]. সূরা ইউসুফ, ৩৯-৪০

[৭৯]. অধিকংশ জাতি ও গোত্রের মাঝে প্রচলিত শিরক ও পৌত্তলিকতার সাথে মিথ্যা ও মনগড়া কথাবার্তা এমনভাবে জড়িত, যেন এ দুটি দুধভাই, কিংবা কখনো =

আসলে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। এসব নামের কেউ ছিল না। আর যদি বাস্তবে কারও এমন নাম থাকেও তাহলে কোনও কাজে তার কোনও কর্তৃত্ব নেই। এগুলো কেবলই কল্পনা। এসব নামের এমন কোনও মালিক নেই, যে ওইসব কাজের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বশীল।

কর্তৃত্বশীল সত্তার নাম আল্লাহ, মুহাম্মাদ বা আলী তাঁর নাম নয়। আর যাদের নাম মুহাম্মাদ বা আলী, তাদের কোনও কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং বাস্তবে মুহাম্মাদ বা আলী নামের এমন কোনও সত্তা নেই, পৃথিবীতে যাদের কর্তৃত্ব চলে, বরং এগুলো কেবলই কল্পনা। অথচ এ জাতীয় কল্পনা করার কোনও হুকুম আল্লাহ তাআলা দেননি এবং তাঁর মোকাবেলায় অন্য কারও হুকুম গ্রহণযোগ্য নয়। বরং আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় কল্পনা করতে নিষেধ করেছেন। আর এমন সত্তা কে আছে যার বলার দ্বারা এসব মনগড়া কথাবার্তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে?

মূলত দ্বীন তো এটাই যে, কেবল আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলবে, তাঁর বিপরীতে অন্য কারও হুকুম কখনোই মানবে না। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই পথে চলে না। তারা বরং নিজেদের পীরের রসম-প্রথাকে আল্লাহর হুকুমের উপর প্রাধান্য দেয়।

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, কারও পন্থা বা প্রথা অনুসরণ করা এবং তার হুকুমকে নিজের জন্য দলীল মনে করা ওইসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা কেবল নিজের তাযীমের জন্য

= বিচ্ছিন্ন হবে না এমন দুই বন্ধু। নবীদের শিক্ষা ও আসমানী কিতাবসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিরককে আঁকড়ে ধরা প্রত্যেকটি ভূখণ্ডে এমনসব কাল্পনিক ব্যক্তিদের মাযার রয়েছে, বাস্তবে যাদের কোনও অস্তিত্ব নেই।

মানুষ যেসব মাযার-দরগাহ যিয়ারত করে থাকে এবং দূর-দূরান্ত থেকে যেখানে আগমন করে থাকে, সেগুলোর অধিকাংশই বানোয়াট। খুব কমই এমন আছে যেগুলোর সম্বন্ধ প্রমাণিত। শিরকের সাথে মিথ্যার এই যে সম্পর্ক এটা কুরআনের একটি মুজিযা। কেননা কুরআন শিরককে মিথ্যার সাথে জুড়ে দিয়েছে। 'সুতরাং তোমরা প্রতিমাদের কলুষ পরিহার কর এবং মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাক'- সূরা হজ্জ, ৩০। –নদভী

নির্ধারণ করেছেন। অতএব কেউ যদি এগুলো কোনও মাখলুকের সাথে করে তাহলে তার উপর শিরক সাব্যস্ত হবে।

আর বান্দাদের নিকট আল্লাহর হুকুম পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম হলো রাসূলের সংবাদ। তাই কেউ যদি কোনও ইমাম-মুজতাহিদ, গাউস-কুতুব[৮০], মৌলভী-মাশাইখ, বাপ-দাদা, বাদশা-উজির কিংবা পাদ্রি-পণ্ডিতের কথাবার্তা ও পথ-প্রথাকে রাসূলের নির্দেশনার উপর প্রাধান্য দেয়[৮১] এবং কুরআন-হাদীসের বিপরীতে পীর-উস্তাদের কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে, অথবা খোদ নবীর ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার নিজের হুকুমই শরীয়ত, তার যা মন চাইত নিজের পক্ষ থেকে বলে দিত এবং উম্মতের জন্য সেটাই মানা জরুরি হয়ে যেত- তাহলে এসব দ্বারা শিরক সাব্যস্ত হবে।

বরং আসল হুকুমদাতা আল্লাহ তাআলা। নবী তো কেবল সংবাদদাতা। সুতরাং যার কথা রাসূলের সংবাদের সাথে মিলবে, সেটা মানবে আর যেটা বিপরীত হবে সেটা মানবে না।

---

৮০. মানুষ সাধারণত এমন নামে ডেকে থাকে। -নদভী

৮১. কারণ আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা। আর মুজতাহিদ উলামায়ে কেরাম এবং মাযহাবের ইমামগণ হলেন কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাদাতা; তারা অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করেন, দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করে দেন, সহীহ-যঈফ ও নাসেখ-মানসূখের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেন এবং মুজমাল-মুফাসসাল ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেন। ইজতিহাদ ও যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা যাদের নেই, মুজতাহিদগণ তাদের পক্ষ থেকে সেই কাজটি করে দেন।

সুতরাং যারা তাদের কথা গ্রহণ করে তারা একজন ব্যাখ্যাদাতা, শিক্ষক ও শাস্ত্রজ্ঞের কথা হিসেবে তা গ্রহণ করে। আর সাধারণ মানুষকে ইজতিহাদ ও যাচাই-বাছাই করতে বলা তাদের সাধ্যের বাইরের জিনিসকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি মাযহাবপ্রীতি বা প্রবৃত্তির কারণে কোনও মুজতাহিদের কথাকে কুরআন-হাদীসের উপর প্রাধান্য দেবে, সে প্রবৃত্তির অনুসারী বিবেচিত হবে, মুমিনদের পথের অনুসারী নয়। -নদভী

শান্ত ও বিনয়াবনত হয়ে চূড়ান্ত স্তরের তাযীম একমাত্র আল্লাহর হক

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

হযরত মুআবিয়া রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যার এতে আনন্দবোধ হয় যে, লোকেরা তার জন্য মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়’।[৮২]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি চায় যে, লোকেরা তার সামনে হাত বেঁধে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকুক, কোনও নড়াচড়া করবে না, কোনও কথা বলবে না, এদিক ওদিক তাকাবে না, বরং মূর্তির মত হয়ে থাকবে– যে ব্যক্তি এমন কামনা করে সে জাহান্নামী। কেননা সে খোদা হওয়ার দাবি করে! যে তাযীম ও সম্মান আল্লাহর জন্য খাস– বান্দা তাঁর সামনে হাত বেঁধে আদবের সাথে নামাযে দণ্ডায়মান হয়, সে নিজেকে সেই তাযীমের উপযুক্ত মনে করে!

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, কেবল সম্মান প্রদর্শনের জন্য কারও সামনে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা ওই সকল কাজের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিজের তাযীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই অন্য কারও জন্য তা করা যাবে না।

তোমরা কি স্বহস্তে নির্মিত বস্তুর উপাসনা করছ?

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتّٰى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ.

---

[৮২] জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭৫৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ২৫৫৮২। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। –অনুবাদক

হযরত সাওবান রাযি. বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের কতক গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত না হবে এবং মূর্তিদের পূজা না করবে'।[৮৩]

অর্থাৎ শিরক দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক হলো– কারও নামে মূর্তি বানিয়ে পূজা করল। এটাকে আরবীতে 'সনাম' বলে। আর দ্বিতীয় হলো– কোনও গৃহ-আস্তানা, বৃক্ষ, পাথর, লাকড়ি বা কাগজকে কারও নামে পূজা করল। আরবীতে এটাকে 'ওয়াসান' বলে[৮৪]। এর মধ্যে কবর-মাযার, কোনও বুযুর্গের আস্তানা, কারও নামের লাকড়ি, তাযিয়া[৮৫], ঝাণ্ডা[৮৬], শুদ্দা[৮৭], ইমাম কাসেম এবং পীর দস্তগীর (আবদুল

---

[৮৩] জামে তিরমিযী, হাদীস ২২১৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৩৯৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭২৩৮। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। –অনুবাদক

[৮৪] সম্ভবত গ্রন্থকারের এই কথার ভিত্তি হলো কতক ভাষাবিদের বক্তব্য। তারা বলেছেন– 'সনাম' হলো যা মানুষের আকৃতিতে বানানো হয়। আর 'ওয়াসান' হলো যা এর বিপরীত হয়। আল্লামা যাবীদী 'তাজুল আরূস' (৮/৩৭১) গ্রন্থে 'শুরূহুদ দালাইল' থেকে এমনটি বর্ণনা করেছেন। এই কথার সমর্থন করে ভাষাবিদ আরাফার বক্তব্য যা ইবনে মানযূর 'লিসানুল আরবে' (১৫/২৪১) উল্লেখ করেছেন। আরাফা বলেন– তাদের যেসব খোদার আকৃতি নেই সেগুলো 'ওয়াসান', আর যেগুলোর আকৃতি আছে সেগুলো 'সনাম'।

'সনাম' ও 'ওয়াসান'-এর ব্যাখ্যা ও এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় নিয়ে ভাষাবিদদের বহু রকমের বক্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ উপরিউক্ত বক্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টো বলেছেন। আবার কেউ কেউ এ দুই শব্দের মাঝে কোনও পার্থক্যই করেননি, বরং উভয়টিকে উভয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। তবে কুরআন-হাদীস ও আরবদের কথামালা বিশ্লেষণ করলে প্রথম মতটি শক্তিশালী মনে হয়, যেটাকে গ্রন্থকার গ্রহণ করেছেন। –নদভী

[৮৫] অর্থাৎ কাগজ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হুসাইন রাযি.-এর নকল মাযার, যেটাকে কাঁধে বহন করে মিছিল-শোভাযাত্রা করা হয়। তখন হযরত হুসাইন রাযি.-এর প্রতি শোকগাঁথা এবং তাঁর প্রতি যে জুলুম-অন্যায় হয়েছে সেগুলোর দাস্তান সম্বলিত কবিতা পাঠ করা হয়। অতঃপর আশুরার দিন দাফন করা হয়। –নদভী

[৮৬] কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন রাযি. ও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বাহিনীর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে হুসাইন রাযি.-এর পরিবারের সদস্যগণ, যোদ্ধা ও =

কাদের জীলানী)-এর মেহেদী[৮৮], ইমামের মাচান, উস্তাদ বা পীরের বসার স্থান ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা এগুলোর তাযীম করে, সেখানে গিয়ে হাদিয়া-উপঢৌকন পেশ করে এবং মানত করে।

অনুরূপভাবে কতক শহীদের নামে তৈরিকৃত মেহরাব, পতাকা ও তোপ-কামান। মানুষ সেগুলোতে প্রাণী উৎসর্গ করে এবং সেগুলোর নামে কসম খায়। একইভাবে কিছু গৃহকে কতক রোগের নামে বা হিন্দুদের বিভিন্ন দেবতার নামে ঘোষণা করা হয়, যেমন– শিতা, কালি, কল্কি ইত্যাদির আস্তানা। মোটকথা, এসবই 'ওয়াসান'।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিয়ামতের আগে মুসলিমরা মুশরিক হয়ে যাবে, তো তাদের শিরক এই ধরনেরই হবে। তারা এই ধরনের বিভিন্ন জিনিসকে মানবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুশরিকরা, যেমন হিন্দু ও আরবের মুশরিক

= সহযোগী বাহিনী যে পতাকাসমূহ উত্তলন করেছিলেন সেই পতাকাসমূহের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে হিন্দুস্তান ও ইরাকে (এবং ইরানে) শিয়ারা মুহার্‌রাম মাসে অনেক পতাকা উত্তলন করে থাকে। –নদভী

৮৭. উর্দূতে শুদ্দাহ ও শুদ্দা- বলা হয়। এটা এক ধরনের পতাকা যা মুহার্‌রামে কাগজের তৈরি কবর অর্থাৎ তাযিয়ার সাথে উত্তলন করা হয় এবং তার সাথে ঘুরানো হয়। এটাতে মূলত এক মুষ্টি রূপা একটা লাকড়ির সাথে বাঁধা হয় এবং তার উপর লাল ও সবুজ কাপড় পেঁচানো হয়। শুদ্দাহ শব্দটি আরবী শাদ্দা থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো বাঁধা। –নূরুল লুগাত ৩/৪৩০; ফরহাঙ্গে আসিফিয়্যাহ ৩/১৭০। –নদভী

[৮৮] শিয়া ইমামিয়ারা রঙ্গিন কাগজ দিয়ে একটি চৌকা আকৃতি বানিয়ে তার চারো দিকে লাল-সবুজ মোমবাতি জ্বালায় এবং তারা এটার নাম দেয় মেহেদী। এটাকে তারা ওই তাযিয়ার ঘরে রেখে দেয়। –নূরুল লুগাত, ৪/৬৮৪।
ইমাম কাসেম দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত হাসান রাযি.-এর ছেলে কাসেম রহ., যার নিকট হযরত হুসাইন রাযি. তাঁর ভাই হাসান রাযি.-এর ওসিয়ত রক্ষার্থে কারবালার ময়দানে নিজের কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন। শিয়া ও তাদের অনুসারীদের নিকট এই মেহেদীর কারণ হলো, কাসেম বিন হাসান চৌদ্দ বছর বয়সে তার চাচার সাথে শহীদ হন। আর মেহেদী হলো খুশী ও সাজসজ্জার প্রতীক। বিবাহ-শাদীতে হাদিয়াস্বরূপ তা দেওয়া হয় এবং নববধূ তা দিয়ে উভয় হাত রঙ্গিন করে। –নদভী

সম্প্রদায়, তারা অধিকাংশ 'সনাম' বা মূর্তিপূজক। এরা উভয়ই মুশরিক, আল্লাহবিমুখ এবং রাসূলের দুশমন।

নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে পশু জবাই একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশেষিত

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَخْرَجَ صَحِيْفَةً مَكْتُوْبٌ فِيْهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

হযরত আলী রাযি. একটি পুস্তিকা বের করলেন, যাতে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীস) লেখা ছিল– 'আল্লাহ লানত করেন ওই ব্যক্তির উপর, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য জবাই করে!'[৮৯]

অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য পশু জবাই করবে সে অভিশপ্ত। হযরত আলী রাযি. একটি পুস্তিকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস লিখে রেখেছিলেন। এই হাদীসটি সেগুলোরই একটি।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, কারও নামে জবাই করাও ওই সকল কাজের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিজের তাযীমের জন্য খাস করেছেন। অতএব পশু জবাই একমাত্র তাঁরই নামে করতে হবে। অন্য কারও নামে জবাই করা শিরক।[৯০]

---

[৮৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৮; আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী, হাদীস ১৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৬০৪। –অনুবাদক

[৯০] প্রত্যেক বুঝমান লোক জানেন যে, যেসব পশু কারও মেহমানদারীর জন্য কিংবা ওলীমা ইত্যাদির জন্য জবাই করা হয়, সেগুলো এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য কেবল ওই সকল প্রাণী, যেগুলোকে দ্বীনী বিশ্বাস থেকে কারও নৈকট্য অর্জনের জন্য, উপকার লাভের জন্য কিংবা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদত মনে করে জবাই করা হয়। ফিকহের কিতাবাদিতে এ সম্পর্কিত প্রচুর উদ্ধৃতি রয়েছে এবং গাইরুল্লাহর জন্য জবাই করা নিষিদ্ধ ও এর গোশত খাওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিশদভাবে উল্লিখিত আছে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। –নদভী

জাহিলী আচার-প্রথা ও আকীদা-বিশ্বাস শেষ যামানায় আবার ফিরে আসবে

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزّٰى، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ﴾ [التوبة: ٣٣] أَنَّ ذٰلِكَ تَامًّا، قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذٰلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، فَتَوَفّٰى كُلَّ مَنْ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَيَبْقٰى مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ، فَيَرْجِعُوْنَ إِلٰى دِيْنِ اٰبَائِهِمْ».

হযরত আয়শা রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– রাত-দিনের অবসান হবে না অর্থাৎ কিয়ামত আসবে না, যতক্ষণ না লাত ও উয্যার ইবাদত করা হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন– 'আল্লাহই তো হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি অন্যসব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন, তাতে মুশরিকরা এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক', তখন আমি মনে করেছিলাম যে, এই অবস্থা শেষপর্যন্ত এমনই পূর্ণাঙ্গ থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন– 'এই পূর্ণতা থাকবে আল্লাহ্ যতদিন চান ততদিন পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ্ তাআলা এক মনোরম বাতাস প্রেরণ করবেন, ফলে যাদের অন্তরে সরিষা-দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে তাদের সকলের মৃত্যু হবে। পরিশেষে যাদের মাঝে কোনও কল্যাণ নেই তারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে। তখন তারা তাদের পিতৃ-পুরুষদের ধর্মে (অর্থাৎ মূর্তিপূজায়) ফিরে যাবে'।[৯১]

---

[৯১] সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৭। দ্রষ্টব্য– মিশকাতুল মাসাবীহের ভাষ্যগ্রন্থ মিরকাতুল মাফাতীহ, হাদীস ৫৫১৯। –অনুবাদক

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবায় ইরশাদ করেছেন–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

'আল্লাহই তো হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি অন্য সব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন, তাতে মুশরিকরা এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক'।

এই আয়াত থেকে হযরত আয়শা রাযি. মনে করেছিলেন যে, এই সত্যধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এটা ততদিন পর্যন্তই বাকি থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন, যার ফলে যাদের অন্তরে সরিষা-দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে তারা সকলেই মৃত্যু বরণ করবে।

আর অবশিষ্ট থাকবে কেবল ওই সকল লোক যাদের মাঝে কোনও কল্যাণ নেই। অর্থাৎ তাদের মাঝে না থাকবে আল্লাহর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, আর না রাসূলের নির্দেশিত পথে চলার আগ্রহ। তারা কেবল বাপ-দাদাদের রসম-রেওয়াজকে দলীল হিসেকে আঁকড়ে থাকবে। আর এভাবেই তাদের মাঝে শিরকের প্রচলন ঘটবে। কারণ পুরাতন বাপ-দাদাদের অধিকাংশই জাহেল-মুশরিক ছিল। ফলে যারাই তাদের পথ-প্রথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করবে তারা এমনি মুশরিক হয়ে যাবে।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, শেষ যামানায় পুরনো শিরক আবার চালু হবে। এখন নবীজীর সেই কথা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। মুসলিমরা নবী-ওলী, ইমাম ও শহীদদের সাথে শিরকি আচরণ করে, এভাবে পুরনো শিরকের বিস্তার ঘটছে।

এমনকি তারা কাফেরদের দেবতাদেরও মানে এবং তাদের প্রথা অনুসরণ করে, যেমন– পুরোহিতদের কাছে প্রার্থনা করা, বিপদাপদে তাদের দ্বারস্থ হওয়া, শুভ-অশুভ ও নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস রাখা, বিভিন্ন রোগের জন্য নির্ধারিত দেবতাদের[৯২] দ্বারস্থ হওয়া এবং হাদিয়া-উপঢৌকনের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য লাভ করা, বিভিন্ন জাহেলী দিবস উদ্‌যাপন করা যেগুলো হিন্দুস্তানী পৌত্তলিক ও ইরানী অগ্নিপূজকরা উদ্‌যাপন করে থাকে, দেওয়ালি[৯৩], নববর্ষ ইত্যাদি উদযাপন করা– এসব হিন্দু ও অগ্নিপূজকদের রীতি-প্রথা মুসলিমদের মাঝে চালু হয়ে গেছে।

এর দ্বারা বোঝা গেল, মুসলিমরা যদি কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে বাপ-দাদাদের রসমের পেছনে পড়ে তাহলে তাদের মাঝে শিরকের রাস্তা খুলবে।

আখিরী যামানায় শয়তানি ফেতনা

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ، ... فَيَبْعَثُ اللهُ

---

[৯২] এখানে গ্রন্থকার কিছু হিন্দু দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের ব্যাপারে হিন্দুস্তানী মুশরিকদের বিশ্বাস হলো, তারা পৃথিবীতে স্বাধীন কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে এবং কিছু রোগ নিরাময়ের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে। –নদভী

[৯৩] যেদিন হিন্দুস্তানের হিন্দুরা ঘর-বাড়ির আলোকসজ্জা করে, অনেক বাতি প্রজ্জ্বলিত করে। আগুন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলা করে। অনেক ধরনের মিষ্টান্ন তৈরি করে একে অপরকে উপঢৌকন হিসেবে দেয় এবং এগুলোর মাধ্যমে সুখ-সম্পদের দেবতা লক্ষ্মীর নৈকট্য অর্জন করে। এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় মিশরের নীল নদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দিবস উদ্‌যাপন ও শাম্মুন নাসীম উৎসবকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ‘ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম’ এবং শাইখ আলী মাহফূযের আল-ইবদা ফী মাযার্‌রিল ইবতিদা’ দেখা যেতে পারে। –নদভী

عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتّٰى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِيْ كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتّٰى تَقْبِضَهُ»، قَالَ: «فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُوْلُ: أَلَا تَسْتَجِيْبُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ..»

আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মতের মাঝেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং চল্লিশ (দিন) পর্যন্ত অবস্থান করবে, এ সময় আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালাম-কে প্রেরণ করবেন, ... তিনি দাজ্জালকে তালাশ করে হত্যা করবেন।

অতঃপর সাতটি বছর লোকেরা এমনভাবে অতিবাহিত করবে যে, কোনও দু'ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা থাকবে না। তখন আল্লাহ তাআলা শামের দিক থেকে শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। ফলে দুনিয়ার বুকে এমন কেউ অবশিষ্ট থাকবে না যার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান থাকবে, বরং এই বাতাসের মাধ্যমে এমন সকলের জান কবজ হয়ে যাবে। এমনকি তোমাদের কেউ যদি পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তবে সেখানেও বাতাস তার নিকট প্রবেশ করে তার জান কবজ করবে।

তখন কেবল মন্দ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। (প্রবৃত্তি চাহিদা পূরণের দিকে) দ্রুতগামী পাখি ও (জুলুম ও অন্যায় কাজে) জ্ঞানশূন্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তাদের অবস্থা হবে। তারা ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দ কাজ দেখে আপত্তি করবে না। এ সময় শয়তান তাদের সামনে দৃশ্যমান হবে এবং তাদেরকে বলবে– তোমরা কি আমার ডাকে সাড়া দেবে না? তারা বলবে– আপনি আমাদেরকে কী আদেশ

করেন? তখন সে তাদেরকে আস্তানাসমূহের (অর্থাৎ কবর-মাযার-দরবার-দরগাহ ইত্যাদি) পূজা করতে নির্দেশ দেবে। এমতাবস্থায়ও তাদের রিযিকে প্রশস্ততা থাকবে এবং তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।[৯৪]

অর্থাৎ শেষ যামানায় ঈমানদার লোকেরা মারা যাবে। কেবল বেকুব লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে, যারা রাত-দিন অন্যের সম্পদ গ্রাস করার ধান্দায় থাকবে, ভালো-মন্দ বাছবিচার করবে না। শয়তান তখন তাদেরকে বলবে– একেবারে বে-দ্বীন হয়ে যাওয়া তো অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ফলে তাদের মাঝে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে।

কিন্তু তারা কুরআন-হাদীসের অনুসরণ না করে কেবল নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি দিয়ে দ্বীনের পথ-পন্থা নির্ধারণ করবে। যার দরুন তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর এই অবস্থায়ও তাদের রিযিকে প্রশস্ততা ও জীবন-যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হবে। এ কারণে তারা আরও বেশি শিরকে লিপ্ত হবে। তারা ভাববে, আমরা তাদেরকে (অর্থাৎ দরবারসমূহকে) যত বেশি মান্য করি, আমাদের চাহিদাসমূহ তত বেশি পূরণ হয়!

সুতরাং আল্লাহর কৌশলকে ভয় করতে হবে। অনেকসময় বান্দা শিরকে লিপ্ত থাকে এবং গাইরুল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করে। তখন আল্লাহ তাআলা পরীক্ষাস্বরূপ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। কিন্তু বান্দা মনে করে, আমি সঠিক পথে আছি। অতএব উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া-না হওয়াকে মাপকাঠি বানাবেন না এবং এর ভিত্তিতে হক ও তাওহীদের ধর্মকে কখনো ত্যাগ করবেন না।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, মানুষ যতই গুনাহের মাঝে ডুবে যাক, যতই নির্লজ্জ হয়ে যাক, অন্যের অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি না করুক এবং ভালো-মন্দের কোনও বাছবিচার না করুক, তারপরও শিরকে লিপ্ত হওয়া এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মানার চেয়ে উত্তম। কারণ শয়তান চায়, মানুষ ওই সকল গুনাহ ত্যাগ করে হলেও শিরকে লিপ্ত হোক!

---

[৯৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৪০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৫৫৫। –অনুবাদক

- হাদীস–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ، حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ».

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যুল খালাসার চারদিকে দাউস গোত্রের নারীদের নিতম্ব ঘুরপাক না খাবে।[৯৫]

দাউস আরবের একটি গোত্রের নাম। যুল খালাসা নামে তাদের একটি মূর্তি ছিল। রাসূলের যুগে সেটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বলে দিয়েছেন– কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে লোকেরা আবার এই মূর্তিকে মানতে শুরু করবে এবং নারীরা এর চারদিকে তাওয়াফ করবে, ফলে তাদের নিতম্ব দুলতে থাকবে।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, আল্লাহর ঘর ব্যতীত অন্যকিছুর তাওয়াফ করা শিরক এবং কাফেরদের রীতি। তাই কখনো তা করা যাবে না।

---

[৯৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯০৬; সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১১৬। হাদীসের বাকি অংশ হলো– যুল খালাসা হলো তাবালা নামক স্থানে থাকা একটি মূর্তি, জাহিলী যুগে দাউস গোত্রের লোকেরা যার উপাসনা করত। ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন– 'আল্ইয়াত' মানে নিতম্ব। উদ্দেশ্য হলো, যুল খালাসার চারদিকে তাওয়াফ করার সময় আন্দোলিত হবে। অর্থাৎ তারা কাফের হয়ে মূর্তিপূজায় ফিরে যাবে। আর তাবালা হলো ইয়ামানের একটি জায়গা (আল-মিনহাজ শরহে সহীহ মুসলিম ১৮/৩৩)। –নদভী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিরক ফিল-আদাতের খণ্ডন

অর্থাৎ অভ্যাসগত কর্মে শিরকের অপনোদন

এই পরিচ্ছেদে ওই সকল আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হবে, যেগুলো দ্বারা এ কথা প্রামাণিত হয় যে, মানুষ দুনিয়াবি কাজকর্মে আল্লাহর সাথে যেরূপ আচরণ করে থাকে এবং তাঁর প্রতি যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে, এরূপ আচরণ অন্য কারও সাথে করা যাবে না।

পৌত্তলিক দর্শন ও দুর্বল মস্তিষ্কসমূহের নারীআসক্তি এবং এক্ষেত্রে মুসলমান কর্তৃক মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ
وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ
وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ
وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ
وَ يُمَنِّيْهِمْ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫
وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾

‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য যাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তারা কেবল কতিপয় নারী। আর তারা যাকে ডাকে সে তো অবাধ্য শয়তান ছাড়া কেউ নয়– যার প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। আর সে (আল্লাহকে) বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য হতে নির্ধারিত এক অংশ নিয়ে নেব। এবং আমি তাদেরকে সরল পথ হতে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব,

তাদেরকে (অনেক) আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়। সে তো তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে। (প্রকৃতপক্ষে) শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতিই দেয়, তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের সকলের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা তা থেকে বাঁচার জন্য পালানোর কোনও পথ পাবে না।[৯৬]

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে, তারা মনে মনে নারীদের কল্পনা করে এবং তাদের নাম জপতে থাকে। কেউ হযরত ফাতেমার নাম নির্বাচন করে, কেউ বীবী আসিয়ার[৯৭] নাম ঠিক করে নেয়, কেউ আবার লাল পরী, কালো পরী, শিতা, কালীসহ অন্যান্য নারীদের নাম আঁকড়ে ধরে।

মোটকথা, তারা শুধু শুধু কল্পনার পেছনে ছুটতে থাকে। বাস্তবে না কোনও পুরুষ আছে, আর না কোনও নারী। এগুলো কেবলই তাদের কল্পনা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা।

---

[৯৬] সূরা নিসা, ১১৭-১২১
এই আয়াতটি কুরআনের মুজিযাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীক ও হিন্দুদের মত মুশরিক জাতিসমূহের অধিকাংশ পৌত্তলিকতা ও পৌরাণিক কল্প-কাহিনী স্ত্রী-দেবী ও নারীশ্রেণিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। নারীদের প্রতি তাদের বিশেষ টান ও প্রচণ্ড আসক্তি রয়েছে। নারীদের সামনেই তারা নতি স্বীকার করে। পুরুষ দেবতাদের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ ও দুর্বল। এসব নারী-দেবীদের নামেই অধিকাংশ মন্দির নির্মিত হয়েছে এবং দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব তাদেরই নামে গীত গেয়েছে। গ্রীক দর্শন ও হিন্দুস্তানী ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি আমার কথার সত্যায়ন করবেন। আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন– 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য যাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তারা কেবল কতিপয় নারী'। –নদভী

[৯৭] প্রসিদ্ধ হলো তিনি ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন। যার ঈমান ও দৃঢ়তার কথা কুরআনে বিবৃত হয়েছে এবং তিনি ঈমান রক্ষা করতে গিয়ে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। দেখুন- তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা তাহরীম। –নদভী

এই যে কখনো কারও মাথায় সওয়ার হয়ে কথা বলে এবং বিভিন্ন কারিশমা দেখায়, এটা শয়তান ছাড়া কেউ নয়। সুতরাং মানুষের যত হাদিয়া-উপঢৌকন, তা সব শয়তানের দরবারে পৌঁছে। তারা তো মনে মনে এসব নারীদেরকে দেয়, কিন্তু বাস্তবে শয়তান সেগুলো নিয়ে নেয়। এর দ্বারা তাদের কোনও ফায়দা হয় না, না দ্বীনি আর না দুনিয়াবি। কারণ শয়তান তো আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত। সুতরাং তার দ্বারা দ্বীনি ফায়দা হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া মানুষের চিরশত্রু মানুষের কল্যাণ চাবে, এটা অসম্ভব।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতিসাধন

বরং সে তো আল্লাহর সামনে ঘোষণা করে এসেছে যে, আমি আপনার অনেক বান্দাকে নিজের গোলামে পরিণত করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব। ফলে তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে। তারা আমার নামে প্রাণী উৎসর্গ করবে এবং সেগুলোতে উৎসর্গের চিহ্ন লাগিয়ে দেবে।

যেমন– প্রাণীর কান চিরে বা কেটে দেবে, অথবা গলায় মালা পরিয়ে দেবে, মাথায় মেহেদী লাগিয়ে দেবে, মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়ে দেবে এবং মুখে পয়সা রেখে দেবে[৯৮]। মোটকথা, উৎসর্গিত প্রাণীকে চিহ্নিত করার জন্য যা যা করা হয়, তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

শয়তান এও বলেছে– আমি তাদেরকে শেখাব। ফলে তারা আল্লাহর বানানো আকৃতি বিকৃত করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের যে আকৃতি তৈরি করেছেন, তা বিকৃত করে ফেলবে। কেউ কারও নামের ঝুটি রাখবে, কেউ কারও নামে নাক-কান ছিদ্র করবে, কেউ দাড়ি মুণ্ডিয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে, কেউ চুল-দাড়ি-ভ্রু কামিয়ে নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ করবে। এগুলো সব শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা।

---

[৯৮] এগুলো সব হিন্দুস্তানের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মুশরিকদের প্রথা। তারা উৎসর্গিত প্রাণীর সাথে এসব করে থাকে। –নদভী

সুতরাং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ছেড়ে চিরদুশমন-শয়তানের পথ অনুসরণ করবে, সে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। কারণ একে তো শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু। দ্বিতীয়ত, কুমন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া তার কোনও ক্ষমতাও নেই। তাই তার কাজই হলো, সে মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অমুককে মানলে এটা হবে, অমুককে মানলে ওটা হবে। সে মানুষকে বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে যে, এত টাকা হলে এমন বাগিচা লাভ হবে ও মহল তৈরি হবে। কিন্তু যখন এসবকিছু লাভ হয় না, তখন মানুষ বিগড়ে যায় এবং আল্লাহকে ভুলে অন্যদের দ্বারস্থ হয়।

আসলে হয় তো তাই, যা আল্লাহ তাআলা তাকদীরে লিখে রেখেছেন। কাউকে মানা-না মানার দ্বারা কিছুই হয় না। বরং এসব হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ধোঁকাবাজি। এসবের পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মানুষ আল্লাহবিমুখ হয়ে যায় এবং শিরকে আক্রান্ত হয়ে খাঁটি জাহান্নামী হয়ে যায়। এমন শয়তানের জালে ফেঁসে যায় যে, যতই ছুটার চেষ্ট করুক ছুটতে পারে না।

মুশরিকদের আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার এবং গাইরুল্লাহর তাযীম ও শোকর আদায়ের বিচিত্র পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা বলেন−

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ اِلَیْهَا ۚ
فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ
اٰتَیْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ ﴿۱۸۹﴾ فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ
فِیْمَاۤ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾

‘আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করতে পারে। তারপর পুরুষ যখন স্ত্রীকে আচ্ছন্ন করল, তখন স্ত্রী (গর্ভের) হালকা এক বোঝা বহন করল, যা নিয়ে সে

চলাফেরা করতে থাকল। অতঃপর সে যখন ভারী হয়ে গেল, তখন (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে দুআ করল, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ সন্তান দান কর তবে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করব। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে একটি সুস্থ সন্তান দান করলেন, তখন তারা আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতে আল্লাহর সঙ্গে অন্যদেরকে শরীক করল, অথচ আল্লাহ তাদের অংশীবাদীসুলভ বিষয়াদি হতে বহু উর্ধ্বে।[৯৯]

অর্থাৎ শুরুতেও আল্লাহই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে স্ত্রী দান করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রশান্তি দান করেছেন। অতঃপর যখন তারা সন্তানের আশা করে তখন তারা আল্লাহকেই ডাকে এবং অঙ্গীকার করে যে, সুস্থ সন্তান হলে আল্লাহর অনেক কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

কিন্তু যখন তিনি সন্তান দান করেন তখন তারা অন্যদেরকে মান্য করা শুরু করে এবং তাদের জন্য হাদিয়া-উপঢৌকন পেশ করে। কেউ সন্তানকে কারও কবরে নিয়ে যায়, কেউ কারও দরবার-আস্তানায় নিয়ে যায়, কেউ কারও নামের ঝুটি রাখে, কেউ কারও নামের মালা পরায়, কেউ কারও নামের জিঞ্জির পরায়, কেউ কোনও পীরের ফকীর ঘোষণা করে, কেউ নাম রাখে 'নবী-বখ্‌শ', 'আলী-বখ্‌শ', কেউ 'পীর বখ্‌শ', কেউ 'শীতলা[১০০]-বখ্‌শ'[১০১], কেউ আবার 'গঙ্গা-বখ্‌শ' নাম রাখে[১০২]।

---

[৯৯] সূরা আরাফ, ১৮৯-১৯০

[১০০] শীতলা হিন্দুদের একটি দেবীর নাম, যাকে তার উপাসনাকারীরা গুটিবসন্ত রোগের মালিক মনে করে। তারা মনে করে, তার ইচ্ছা ছাড়া এই রোগে কেউ আক্রান্ত হয় না এবং তার ইচ্ছা ছাড়া কেউ এই রোগ থেকে আরোগ্যও লাভ করতে পারে না। আবার শীতলা শব্দটি গুটিবসন্ত রোগকে বোঝানোর জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে। দেখুন- নূরুল লুগাত, ৩/৪০। –নদভী

[১০১] বোঝা যায়, বিপদাপদ থেকে মুক্তি ও রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মনগড়া দেব-দেবীর আশ্রয়গ্রহণের প্রচলন হিন্দুস্তানে অনেক পূর্বেই ঘটেছিল। বিশেষত মুসলিমদের মধ্য হতে মূর্খ নারীদের মাঝে। ইমাম সারহেন্দী মুজাদ্দেদে আলফে সানী রহ. =

আল্লাহ তাআলা তো তাদের মানত-কুরবানীর প্রতি বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু তারা নিজেরাই বিতাড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আল্লাহকে মাপে কম দেওয়া এবং অন্যদেরকে তাঁর উপর প্রাধান্য দেওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

‘আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা তার মধ্যে আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে। সুতরাং তারা নিজ ধারণা অনুযায়ী বলে, এ অংশ আল্লাহর এবং এটা আমাদের শরীকদের (অর্থাৎ দেব-দেবীদের)। অতঃপর যে অংশ তাদের শরীকদের জন্য, তা (কখনো) আল্লাহর কাছে পৌছে না, আর যে অংশ আল্লাহর জন্য,

---

= (১০৩৪ হিজরী) কর্তৃক তাঁর অনুসারী একজন নেককার নারী বরাবর লিখিত একটি চিঠিতে আছে–

চরম মূর্খতার দরুন অনেক নারীরা গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থনায় লিপ্ত হয়েছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবং বালা-মুসীবত দূর করার জন্য এমনসব মনগড়া নামের আশ্রয় নিয়েছে, যেগুলোর সপক্ষে আল্লাহ তাআলা কোনও প্রমাণ নাযিল করেননি। ফলে এর মাধ্যমে তারা নিকৃষ্টভাবে শিরক ও শিরকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে স্পষ্ট হয় যখন গুটিবসন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তখন দেখা যায়, নেককার-বদকার সকল নারীরাই এই মূর্খতা ও কুফরীর শিকার হয়। এমন নারী খুব কমই পাওয়া যায়, যে এই শিরক থেকে বাঁচতে পারে এবং এই যুগের প্রচলিত প্রথা থেকে বিরত থাকতে পারে। তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন।

মাকতূব ৩/৪১, মাকতূবাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী। –নদভী

১০২. ইসলামের দৃষ্টিতে এসব নাম আপত্তিকর হওয়ার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন পৃ. ৫২। –অনুবাদক

তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে। তারা যা স্থির করে নিয়েছে তা কতই না নিকৃষ্ট![১০৩]

অর্থাৎ সকল শস্য ও গবাদি পশু আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, অন্য কেউ করেনি। কিন্তু তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেমন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে, তেমনি অন্যদের জন্যও উৎসর্গ করে। বরং অন্যদের জন্য যতটা সতর্কতা ও আদবের সাথে উৎসর্গ করে থাকে, আল্লাহর জন্য ততটা আদবের সাথে করে না![১০৪]

শরীয়ত নয় এমন জিনিসকে শরীয়ত বানানো এবং জরুরি নয় এমন বস্তুকে জরুরি মনে করা

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন–

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ
وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ
سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝١٣٨

‘তারা বলে, এইসব গবাদি পশু ও শস্যতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে। তাদের ধারণা এই যে, আমরা যাদেরকে ইচ্ছা করব তারা ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না এবং কতক গবাদি পশু এমন, যাদের পিঠকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কিছু পশু এমন, যার যবাহকালে আল্লাহর নাম নেয় না (এসবই তারা করে) তাঁর (অর্থাৎ

---

১০৩. সূরা আনআম, ১৩৬

১০৪. আসলে প্রত্যেক ওই ব্যক্তির অবস্থাই এমন, যাকে এমন দুই গ্রুপের মাঝে বণ্টন ও ইনসাফের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যাদের এক গ্রুপের সাথে তার আবেগ-ভালোবাসা এবং ভয় ও আশার সম্পর্ক। পক্ষান্তরে অপর গ্রুপের সাথে তার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ ও ভাসাভাসা কিংবা কেবলই আনুষ্ঠানিক প্রথাগত, যাদের সাথে ইনসাফ করার কিংবা তাদের অধিকার যথাযথ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের ভেতরে কোনও তাড়না অনুভব করে না। ফলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে তাদের অংশ কম দেয়। –নদভী

আল্লাহর) প্রতি মিথ্যারোপ করে। তারা যে মিথ্যাচার করছে, আল্লাহ শীঘ্রই তার প্রতিফল তাদেরকে দেবেন।[১০৫]

অর্থাৎ লোকেরা কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, অমুক জিনিস অচ্ছুত, এটাকে অমুক ব্যক্তি খেতে পারবে আর অমুক পারবে না। কিছু প্রাণীর উপর বোঝাবহন ও আরোহণকে নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয়, এটা অমুকের জন্য উৎসর্গিত, তাই এর আদব রক্ষা করতে হবে।

আবার কতক পশুর উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না, বরং অন্য কারও নাম নেওয়া হয়। অতঃপর তারা মনে করে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ খুশি হন এবং উদ্দেশ্য পূরণ করেন। আসলে এই সবই মিথ্যা, তারা এগুলোর জন্য শাস্তি ভোগ করবে।

- আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

‘আল্লাহ কোনও প্রাণীকে না বাহীরা সাব্যস্ত করেছেন, না সাইবা, না উসিলা আর না হামী, কিন্তু যারা কুফ্‌র অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই সঠিক বোঝে না’।[১০৬]

জাহেলী যুগের মুশরিকরা যে পশুর কান ফেড়ে কারও নামে উৎসর্গ করত, তাকে বাহীরা বলা হত। যে পশুকে দেব-দেবীর নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত, তাকে সাইবা বলত। উসিলা ওই উটনীকে বলা হত, যা প্রথমবার দুটি বাচ্চা জন্ম দিত– প্রথমটি নর ও দ্বিতীয়টি মাদী, তখন তাকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত। আর কোনও নর উট নির্দিষ্ট পরিমাণ (দশবার) পাল দেওয়ার কাজ করলে তার উপর বহন ও আরোহণকে মওকুফ করে দিত, তাকে হামী বলা হত।

---

১০৫. সূরা আনআম, ১৩৮
১০৬. সূরা মায়েদা, ১০৩

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, এসব তিনি বলেননি। এগুলোকে তারা নিজেদের বেকুবির কারণে প্রথা বানিয়ে নিয়েছে।

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, কোনও পশুকে কারও জন্য নির্ধারণ করে তার উপর চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া; অনুরূপভাবে এটা নির্ধারণ করা যে, অমুকের জন্য কেবল গরু উৎসর্গ করা যায়, অমুকের জন্য শুধু ছাগল আর অমুকের জন্য কেবল মুরগী– এই সবই মূর্খতাপ্রসূত রসম-প্রথা এবং আল্লাহর হুকুমের লঙ্ঘন।

- আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى
اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾

'যে সব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা রচনা করে, সে সম্পর্কে বলো না– এটা হালাল এবং এটা হারাম। কেননা তার অর্থ হবে তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিচ্ছ। জেনে রেখ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা সফলকাম হয় না'।[১০৭]

অর্থাৎ নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে বলো না যে, অমুক কাজ কর আর অমুক কাজ করো না। কারণ কোনও কাজকে বৈধ বা অবৈধ সাব্যস্ত করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। সুতরাং এই কথার মাধ্যমে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করা হয়। আর এই চিন্তা করা যে, অমুক কাজ এভাবে করলে উদ্দেশ্য হাসেল হয় আর না করলে ক্ষতি হয়– এটা মনগড়া ও গলদ কথা। কারণ আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করার দ্বারা কখনো উদ্দেশ্য হাসেল হতে পারে না।

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, যারা বলে– মুহার্‌রম মাসে পান খাবে না, লাল কাপড় পরবে না; হযরত ফাতেমার নামে পাকানো খাবার পুরুষরা খাবে না, এই খাবারের মধ্যে অমুক অমুক সবজি অবশ্যই থাকতে হবে, যে নারীরা এই খাবার খাবে তারা অবশ্যই

---

[১০৭] সূরা নাহ্‌ল, ১১৬

মেহেদী ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সাজ গ্রহণ করবে। কোনও দাসী এবং দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ নারী এই খাবার খাবে না। অনুরূপভাবে নিচু শ্রেণির নারীরা এবং ব্যভিচারিণীরাও খাবে না। শাহ আবদুল হকের পাথেয় কেবল পায়েসই হবে, তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বানাতে হবে, হুক্কাখোররা এটা খেতে পারবে না। শাহ মুদারের নামে কেবল 'মালীদা'ই (ঘি ও চিনিতে চূর্ণ করা রুটি) উৎসর্গ করতে হয়, বূ আলী কলন্দরের[১০৮] তিনমণী হাদিয়া এবং আসহাবে কাহাফের গোশত-রুটি ও ওরসে অমুক অমুক রীতি অবশ্যই পালন করতে হবে। কোনও আত্মীয়ের মৃত্যুর সময় অমুক অমুক প্রথা পালন করতে হবে এবং মৃত্যুর পরে নিজেরা বিবাহ করতে পারবে না, অন্যদের বিবাহে উপস্থিতও হতে পারবে না এবং আচার বানাতে পারবে না। অমুক ব্যক্তিরা নিল কাপড় পরতে পারবে না, অমুক ব্যক্তি লাল কাপড় পরতে পারবে না[১০৯]। যারা এসব বলে, তারা সবাই আসলে মিথ্যাবাদী এবং শিরকে আক্রান্ত। তারা আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে অনধিকারচর্চা করে, এমনকি নিজেদের জন্য একটা স্বতন্ত্র শরীয়ত কায়েম করে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন তারকার প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক

বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত আছে–

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ

---

[১০৮] হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ শাইখ শরফুদ্দীন বূ আলী কলন্দর পানিপথী রহ. উদ্দেশ্য। তিনি শাইখ শামসুদ্দীন তাবরীযি থেকে তাসাওউফ শিক্ষা করেছেন এবং তিনি সোহওয়ার্দি তরীকার ছিলেন। তার মৃত্যু হয়েছিল ৭২৪ হিজরীতে। তিনি পানিপথে সমাধিস্থ হন। –নদভী

[১০৯] এসব জাহিলী রসম-রেওয়াজ প্রতিবেশী হিন্দু-ব্রাহ্মণদের সাথে মেলামেশার কারণে হিন্দুস্তানের মুসলিমদের মাঝেও অনুপ্রবেশ করেছে এবং তারা এগুলোকে অত্যন্ত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে, যেন কুরআনের বাণী কিংবা শরীয়তের হুকুম, বরং তারচেয়েও বেশিকিছু! –নদভী

اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী রাযি. বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বৃষ্টি হবার পর হুদায়বিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন– তোমরা কি জান, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা উত্তর দিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন– বান্দাদের মধ্যে কেউ সকাল করল আমার প্রতি মুমিন থেকে আর কেউ কাফের হয়ে। যে বলল, আল্লাহর দয়া ও করুণায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি সে আমার প্রতি বিশ্বাসী, এবং নক্ষত্রকে অস্বীকারকারী। আর যে বলল, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, এবং সে আমাকে অস্বীকারকারী নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।[১১০]

অর্থাৎ কেউ যদি পৃথিবীর কোনও কার্যক্রমকে নক্ষত্রের প্রভাব মনে করে তাহলে আল্লাহ তাকে আল্লাহর অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং নক্ষত্রপূজারী গণ্য করেন। আর যে এই সকল কার্যক্রমের পরিচালক একমাত্র আল্লাহকে মনে করে, আল্লাহ তাআলা তাকে নক্ষত্রপূজারীদের থেকে বের করে স্বীয় মাকবূল বান্দাদের মধ্যে গণ্য করেন।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, শুভ ও অশুভ ক্ষণ মানা, ভালো ও মন্দ দিন-তারিখ জিজ্ঞাসা করা এবং জ্যোতিষীদের কথাকে বিশ্বাস করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এইসব নক্ষত্রের সাথে সম্পৃক্ত, আর নক্ষত্রকে মানা নক্ষত্রপূজারীদের কাজ।

---

[১১০] সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭১। –অনুবাদক

গায়েবের সংবাদদাতা ও গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আস্থা রাখা কুফরি

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ».

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছু শিক্ষা করল, সে যাদুবিদ্যার একটা শাখা শিক্ষা করল। তা যত বৃদ্ধি পাবে যাদুবিদ্যাও তত বৃদ্ধি পাবে।[১১১]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কুরআনে নক্ষত্রের আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত ও হিকমাত প্রকাশ পায়, আকাশ সজ্জিত হয় এবং এর মাধ্যমে শয়তানকে মেরে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা কোথাও এটা বলেননি যে, এই জগৎ-কারখানায় নক্ষত্রের কোনও ভূমিকা আছে এবং দুনিয়াতে কোনও ভালো-মন্দ এগুলোর প্রভাবে হয়।

সুতরাং নক্ষত্র সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন, তা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হাসেলের চেষ্টা করবে এবং নক্ষত্র গণনা করে গায়েবের বিষয়াদি বলে বেড়াবে, সে মূলত ওই ঋষির মত যে জিনদের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে গায়েবের কথা বলে থাকে, যাকে আরবিতে 'কাহেন' (গণক) বলা হয়। এই ব্যক্তিও ওই ঋষির মত তারকার মাধ্যমে বিভিন্ন গায়েবি কথাবার্তা বলে থাকে। সুতরাং জ্যোতিষী এবং গণকের পন্থা যেন একই। গণক তো

---

[১১১] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০০০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯০৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৭২৬। ইমাম নববী রহ. হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন (রিয়াযুস সালিহীন, হাদীস ১৬৭১)। এখানে লেখকের উল্লিখিত বর্ণনায় আরওকিছু শব্দ আছে, তা হলো– জ্যোতিষী একজন গণক, আর গণক হলো যাদুকর, আর যাদুকর কাফের। শব্দগুলো মিশকাতে রযীনের হাওয়ালায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সনদসহ হাদীসটি যত জায়গায় দেখেছি, কোথাও এই অংশটি নেই। –অনুবাদক

যাদুকরদের মত জিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে। আর তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয় তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ডাকা এবং ভোগ দেওয়ার মাধ্যমে। আর এগুলো কুফরি কাজ। সুতরাং গণক, জ্যোতিষী এবং যাদুকর, সবাই কুফরির পথে চলে!

- মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً».

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈকা স্ত্রী বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– কেউ যদি কোনও ভবিষ্যদ্বক্তা-গণকের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না।[১১২]

অর্থাৎ গায়েবের কথা বলার দাবি করে এমন ব্যক্তির কাছে গিয়ে কোনওকিছু জিজ্ঞাসা করলে তার চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না। কেননা সে শিরকে লিপ্ত হয়েছে আর শিরক সকল ইবাদতের নূরকে মিটিয়ে দেয়। জ্যোতিষী, গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, কিতাব দেখে শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ধারণকারী এবং নির্ভুল কাশফ ও ইস্তিখারার দাবিদার সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

জাহিলী সমাজ ও তার অনুসারী মুসলিমদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার নিদর্শনসমূহ

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে,

عَنْ قَبِيْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اَلْعِيَافَةُ، وَالطِّيَرَةُ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ».

হযরত কাবীসা রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– পাখি তাড়িয়ে ভালো-মন্দ নির্ণয় করা,

---

[১১২] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৩০। –অনুবাদক

কোনওকিছুকে অলক্ষুণে মনে করা এবং মাটিতে রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করা কুফরী প্রথা ও শয়তানী কর্মকাণ্ড।[১১৩]

- সুনানে আবু দাউদের অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ»

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক! অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক! অলক্ষুণে মনে করা শিরক![১১৪]

আরবের লোকদের মধ্যে (শুভ-অশুভ) লক্ষণ গ্রহণ করার প্রবণতা অনেক বেশি ছিল এবং এর উপর তাদের অনেক বিশ্বাস ছিল। তো এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার বলেছেন– এটা শিরক, যেন মানুষ বিরত থাকে।

- সুনানে আবু দাউদের আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: «لَا هَامَةَ وَلَا عَدْوٰى، وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ»

হযরত সাআদ ইবনে (আবী ওয়াক্কাস) মালেক বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– প্যাঁচা

---

[১১৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯০৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৯১৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬১৩১। ইমাম নববী রহ. হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন (রিয়াযুস সালিহীন, হাদীস ১৬৭০)। –অনুবাদক

[১১৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৬১৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৫৩৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬১২২। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। –অনুবাদক

অলক্ষুণে নয়, রোগের কোনও সংক্রমণ নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কোনওকিছু নেই। অশুভ লক্ষণ যদি কোনওকিছুতে থেকে থাকে, তাহলে সেটা ঘোড়া, নারী ও বাড়িতে।[১১৫]

অর্থাৎ আরবের মূর্খ সমাজে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করার পর যদি তার হত্যার প্রতিশোধ না নেওয়া হয়, তাহলে তার মাথার খুলি থেকে একটি প্যাঁচা বের হয়ে ঘুরে ঘুরে ফরিয়াদ করতে থাকে, এটাকেই 'হামা' বলা হয়। তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ কথা গলদ।

এর দ্বারা বোঝা গেল, কেউ যদি বলে, মানুষ মরে যাওয়ার পরে অন্য কোনও প্রাণীর আকৃতিতে ফিরে আসে তাহলে সে মিথ্যাবাদী।

তাদের মধ্যে এ কথাও প্রচলিত ছিল যে, কিছু কিছু রোগ, যেমন- খুজলি-পাঁচড়া এবং কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি একজন থেকে আরেকজনের মাঝে সংক্রমিত হয়। তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- এটাও গলদ।

সুতরাং এর দ্বারা বোঝা গেল, মানুষের যে অভ্যাস- কোনও ছেলের গুটিবসন্ত হলে তার থেকে দূরে থাকে এবং অন্য ছেলেদেরকে

---

[১১৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯২১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫০২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হদীস ৬১২৭। -অনুবাদক। সহীহ বুখারী (৫০৯৩)-তে হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- কুলক্ষণ (থেকে থাকলে তা) কেবল তিন জিনিসের মধ্যে রয়েছে- বাড়ি, নারী এবং ঘোড়া। এর ব্যাখ্যা তবারানী (২৪/১৫৩) বর্ণিত হযরত আসমা বিনতে উমাইসের হাদীসে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বাড়ির কুলক্ষণের দিক কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- এর আয়তন সংকীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবেশী মন্দ হওয়া। বলা হলো, বাহনের মধ্যে কুলক্ষণ কী? তিনি বললেন- পিঠে চড়তে না দেওয়া এবং মন্দ স্বভাবের হওয়া। জিজ্ঞাসা করা হলো, আর নারীর মাঝে কুলক্ষণ কী? তিনি বললেন- বন্ধ্যা হওয়া এবং স্বভাব-চরিত্র মন্দ হওয়া। -নদভী

তার কাছে যেতে দেয় না, পাছে তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ে– এটা কুফরী প্রথা। এটা মানা যাবে না।[১১৬]

তাদের মাঝে আরেকটি বিষয় প্রসিদ্ধ ছিল যে, অমুক কাজটি অমুকের জন্য অমঙ্গলজনক সাব্যস্ত হয়েছে, তার জন্য শুভ হয়নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– এটাও গলদ কথা। বাস্তবে যদি অমঙ্গলজনক কোনওকিছু থেকে থাকে সেটা হলো বাড়ি, নারী আর ঘোড়া।

এ দ্বারা বোঝা গেল যে, এই জিনিসগুলো কখনো মঙ্গলজনক হয় আর কখনো তার উল্টো। কিন্তু কোনটা মঙ্গলজনক আর কোনটা অমঙ্গলজনক, তা নির্ধারণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনও মাপকাঠি বলে দেননি।

সুতরাং মানুষ যে বলে থাকে, যে ঘরে সিংহের মুখ অঙ্কিত থাকে, যে ঘোড়ার কপালে তারকা চিহ্ন থাকে এবং যে নারীর জিহ্বা কালো হয়, এগুলো অশুভ ও অমঙ্গলজনক– তাদের এই কথার কোনও ভিত্তি নেই। বরং মুসলিমদের কর্তব্য হলো, তারা এ জাতীয় কথায় কোনওরূপ কর্ণপাত করবে না।

আর যখন কোনও নতুন ঘর-বাড়ি বা ঘোড়া কিনবে, কিংবা বিবাহ করবে তখন আল্লাহর কাছে মঙ্গল কামনা করবে এবং তাঁরই নিকট এগুলোর অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর বাকি অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে কখনো এই চিন্তাকে মনে জায়গা দেবে না যে, অমুক কাজটি আমার জন্য শুভ হয়েছে আর অমুকটি অশুভ হয়েছে।

---

[১১৬] এটা তখন, যখন এই ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে কোনও অদৃশ্য শক্তির প্রভাবের উপর কিংবা এমন কোনও দ্বীনী বিশ্বাসের উপর, যার ভিত্তি হলো (গাইরুল্লাহর ব্যাপারে) স্বাধীন কর্তৃত্ব ও আক্রান্ত করার ক্ষমতার বিশ্বাস করা। –নদভী

- বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا عَدْوٰى وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ».

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– রোগের কোনও সংক্রমণ নেই, সফর বলতে কোনও জিনিস নেই এবং প্যাঁচা অলক্ষুণে নয়।[১১৭]

---

[১১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২২০। –অনুবাদক
রোগের সংক্রমণকে নাকচ করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেমন বুখারীর বর্ণিত এই হাদীসে রয়েছে। আবার কিছু হাদীস থেকে সংক্রামক ব্যাধির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– 'কুষ্ঠরোগীর কাছ থেকে পলায়ন কর, যেমন সিংহ দেখলে পলায়ন কর'!

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের অনেক ধরনের মতামত রয়েছে। তবে অগ্রগণ্য মত হলো, সংক্রামক ব্যাধিকে নাকচ করা ও স্বীকার করা সংক্রান্ত দুই বক্তব্যের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন দুই অবস্থার সাথে। সুতরাং যে হাদীসে বলা হয়েছে, রোগের কোনও সংক্রমণ নেই, এর দ্বারা ওই সকল লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদের বিশ্বাস অত্যন্ত মজবুত এবং তাওয়াক্কুল একেবারে নির্ভেজাল। ফলে তারা তাদের অন্তর থেকে সংক্রমণের বিশ্বাসকে ছুড়ে ফেলতে পারে। সুতরাং কুষ্ঠরোগীর সাথে খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সামনে হযরত জাবের রাযি.-এর যে হাদীস আসছে এবং এ জাতীয় অন্যান্য যাবতীয় হাদীসের সম্পর্ক এই অবস্থার সাথেই।

আর যেখানে কুষ্ঠরোগীর কাছ থেকে পলায়ন করতে বলা হয়েছে, তাতে সম্বোধন করা হয়েছে মূলত ওই সকল লোককে, যাদের ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণে অন্তর থেকে সংক্রমণের বিশ্বাসকে দূর করতে পারে না। তাই তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে সংক্রমণে বিশ্বাসের রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়টিই করেছেন, যেন উভয় শ্রেণি তাঁকে অনুসরণ করতে পারে।

কেউ কেউ এটাও বলেছেন– রোগের সংক্রমণকে নাকচ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনও রোগ নিজ ক্ষমতায় সংক্রমিত হতে পারে না, যেমনটা জাহিলী সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করত। বরং আল্লাহ তাআলা সংক্রমণের রীতি চালু করেছেন বিধায় সংক্রমিত হয়। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভীর 'লা-মিউদ্ দারারী' থেকে সংগৃহিত। –নদভী

অর্থাৎ আরবের জাহেলী সমাজে এ কথাও প্রচলিত ছিল যে, যে ব্যক্তি খেলেও ক্ষুধা নিবারণ না হওয়ার রোগে আক্রান্ত হয়, যাকে হাকীমরা ‘কুকুরের ক্ষুধা’ বলে, তার পেটের মধ্যে একটি ভূত ঢুকে গেছে, ওই ভূতই সব খেয়ে ফেলে। এটাকে ‘সফর’ বলে[১১৮]। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই কথা গলদ, কোনও ভূত-টুত নয়।

এ দ্বারা বোঝা গেল, লোকেরা যে কতক রোগকে ভূতের আসর ও প্রভাব মনে করে, যেমন– বসন্তরোগ ইত্যাদি, তাদের এইসব ধারণা গলদ।

তাদের মাঝে এটাও প্রসিদ্ধ ছিল যে, সফর মাস অমঙ্গলজনক। তাই এই মাসে কোনও কাজ করা ঠিক না[১১৯]। তাদের এই ধারণাও গলদ ছিল।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, এমন কথা বলা– সফর মাসের প্রথম তেরো দিন অশুভ, এসব দিনে বালা-মুসীবত অবতীর্ণ হয় এবং এই কারণে এই দিনগুলোর নাম ‘তেরাহ তেজী’[১২০] রাখা এবং মনে

---

[১১৮] কাসতাল্লানী রহ. বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (৮/৩১৮) বলেন– কথিত আছে যে, ‘সফর’ একটি প্রাণী, যা ক্ষুধার সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি কখনো কখনো এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মেরে ফেলে। তারা মনে করত, এটা গুটিবসন্ত থেকেও বেশি সংক্রামক। এ কথা ইমাম মুসলিম রহ. হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে তার থেকে উল্লেখ করেন। সুতরাং এটাকেই এর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা জরুরি। –নদভী

[১১৯] ‘লা-সফারা’-এর ব্যাখ্যায় বায়যাবী রহ. বলেন– এর দ্বারা সফর মাসে অধিকহারে বালা-মুসীবত আসে বলে যে ধারণা করা হয়, সেটাকে নাকচ করা হয়েছে। (কাসতাল্লানী কৃত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ৮/৩১৮)। অনুরূপভাবে আল্লামা তাহের পাটনীর ‘মাজমাউ বিহারিল আনওয়ারে’ (২/২৫১) রয়েছে– এক মত অনুযায়ী এর দ্বারা প্রচলিত আরবি সফর মাস উদ্দেশ্য। তারা মনে করত, এই মাসে বালা-মুসীবত ও ফেতনা অনেক বেশি দেখা দেয়। তো হাদীসে এই ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। –নদভী

[১২০] মানে ‘তেরোটি তীব্র বা উত্তপ্ত দিন’। –নদভী

করা যে, এসব দিনের তীব্র তেজে কিছু কাজ বিগড়ে যায়, অনুরূপভাবে কোনও মাস-তারিখ বা দিনকে অশুভ মনে করা– এই সবই শিরকি কথাবার্তা।

- সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: «كُلْ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ».

হযরত জাবের রাযি. বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কুষ্ঠরোগীর হাত ধরে তাঁর সাথে একই প্লেটে বসালেন এবং বললেন– আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রেখে খাও।[১২১]

অর্থাৎ আল্লাহর উপর আমাদের আস্থা ও ভরসা আছে। তিনি যাকে চাবেন অসুস্থতা দেবেন আর যাকে চাবেন সুস্থ করে দেবেন। আমরা কোনও অসুস্থ ব্যক্তির সাথে খাওয়া-দাওয়া পরিহার করি না এবং কোনও রোগের সংক্রমণকে মানি না।

আল্লাহর শানে অজ্ঞতা ও বেয়াদবিপূর্ণ কথাবার্তার উপর চুপ থাকা জায়িয নয়

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে,

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ، وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ اللهَ لَنَا، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْحَكَ أَتَدْرِيْ مَا تَقُوْلُ؟» وَسَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذٰلِكَ فِيْ وُجُوْهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّهُ

---

[১২১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৫৪২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯২৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৮১৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬১২০।

-অনুবাদক

لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ، وَيْحَكَ أَتَدْرِيْ مَا اللهُ، إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهٰكَذَا»، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ، «وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ».

হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম রাযি. বলেন– এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ অতিশয় কষ্ট পাচ্ছে, পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় মরে যাচ্ছে, সম্পদ ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং পশু-প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাই আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করুন! কেননা আমরা আল্লাহর দরবারে আপনার মাধ্যমে এবং আপনার নিকট আল্লাহর মাধ্যমে সুপারিশ পেতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আফসোস তোমার জন্য! তুমি কি জান, তুমি কী বলছ? এরপর তিনি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলতে লাগলেন এবং লাগাতার তাসবীহ পাঠ করতে থাকলেন, এমনকি তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এর (বিরূপ) চিহ্ন পরিলক্ষিত হল।

অতঃপর বললেন– তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহর সুপারিশ নিয়ে তাঁর কোনও সৃষ্টির নিকট যাওয়া যায় না (অর্থাৎ তিনি তাঁর কোনও সৃষ্টির নিকট সুপারিশ করেন না), তাঁর মর্যাদা এর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। আফসোস তোমার জন্য! তুমি কি জান, আল্লাহ কে? আকাশসমূহের উপর তাঁর সিংহাসন এমন—এটা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়েছেন যে, তার উপর গম্বুজের মত রয়েছে। আর সেটা তাঁকে নিয়ে তেমন আওয়াজ করে যেমন বাহন আরোহীকে নিয়ে আওয়াজ করে।[১২২]

অর্থাৎ আরবে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এক বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এর ভয়াবহতা বর্ণনা

---

১২২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৭২৬; আস-সুন্নাহ ইবনে আবী আসেম, হাদীস ৫৭৫। হাদীসটির সনদ যঈফ। দেখুন- সুনানে আবু দাউদের টীকায় শাইখ শুআইবের তাখরীজ। –অনুবাদক

করল এবং দুআ চাইল। সে বলল– আমরা আল্লাহর দরবারে আপনার মাধ্যমে এবং আপনার নিকট আল্লাহর মাধ্যমে সুপারিশ পেতে চাই। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর যবান দিয়ে আল্লাহর বড়ত্ব-মহত্ত্বের কথা বের হতে থাকে। এমনকি আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের প্রভাবে পুরো মজলিসের চেহারা পাল্টে যায়।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে বোঝালেন যে, কাউকে কারও নিকট সুপারিশকারী বানানোর অর্থ হলো, মূল কাজটি তার এখতিয়ারেই থাকে, তবে সে সুপারিশকারীর খাতিরে তা করে দেয়।

সুতরাং যখন তুমি বললে, আমরা নবীর নিকট আল্লাহকে সুপারিশকারী বানালাম, তখন এর অর্থ দাঁড়াল– আসল কর্তা নবী, আর আল্লাহ তাআলা সুপারিশকারী! তো এই কথা সম্পূর্ণ গলদ।

আল্লাহর শান ও মর্যাদা অনেক উঁচু। সকল নবী-ওলী তাঁর সামনে একটি কণার চেয়েও ক্ষুদ্র। তাঁর আরশ সকল আসমান-জমিনকে একটি গম্বুজের মত করে বেষ্টন করে আছে। সেই আরশ এত বড় হওয়া সত্ত্বেও ওই শাহানশাহকে নিয়ে তেমন আওয়াজ করে যেমন আরোহীকে নিয়ে বাহন মচমচ আওয়াজ করে।

সুতরাং কোনও মাখলুকের পক্ষে তাঁর বড়ত্ব-মহত্ত্ব যথাযথ অনুধাবন করা এবং বয়ান করা সম্ভব নয়। আর তাঁর কাজে নাকগলানো ও তাঁর রাজত্বে হস্তক্ষেপ করার তো প্রশ্নই আসে না।

তিনি তো এমন রাজাধিরাজ যে, কোনও সৈন্যবাহিনী ব্যতীত এবং কোনও মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ব্যতীত এক মুহূর্তেই কোটি কোটি কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। তাহলে তিনি আবার কার কাছে সুপারিশ করবেন? কার এই সাহস আছে যে, তাঁর সামনে কোনও কাজের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী বনে বসবে?

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর দরবারে সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা তো এই যে, একজন বেদুঈনের মুখে এতটুকু কথা শুনেই ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন এবং আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত আল্লাহর যে বড়ত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ তা বর্ণনা করতে শুরু করেছেন।

তাহলে এবার ওই সকল লোকের কথা একটু চিন্তা করুন, যারা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভাই-ব্রাদার বা বন্ধু-বান্ধবসুলভ বিভিন্ন মারাত্মক কথাবার্তা বলে থাকে।

কেউ বলে, আমি তো এক পয়সা দিয়ে আল্লাহকে কিনে ফেলেছি; কেউ বলে, আমি আমার প্রভু থেকে দুই বছরের বড়! আরেকজন বলে, আমার প্রভু যদি আমার পীর ছাড়া অন্য কোনও আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়, তাহলে আমি তার দিকে তাকাব না! এক কবি বলেছে,

> মুহাম্মাদের ভালোবাসার ব্যথিত হৃদয় আমি ধারণ করি,
> এই ভালোবাসায় আমি আমার প্রভুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি!;

আরেক কবি বলেছে,

> আল্লাহর ব্যাপারে যা খুশি বল,
> তবে মুহাম্মাদের ব্যাপারে কথা বলতে খুব সাবধান থেক![১২৩]

কেউ তো মুহাম্মাদের হাকীকতকে হাকীকতে ইলাহী থেকেও উত্তম গণ্য করে! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব প্রলাপ থেকে হেফাযত করুন।

---

[১২৩] এখানে গ্রন্থকার যেসব কথাবার্তা উল্লেখ করেছেন, এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় বলা বিভিন্ন সীমালঙ্ঘনকারীর বক্তব্য থেকে চয়নকৃত। এগুলোর মধ্যে কিছু উর্দূ ও ফারসী ভাষায় প্রবাদ হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। —নদভী

এক কবি খুবই চমৎকার উক্তি করেছেন–

از خدا خوائیم توفیق ادب
بے ادب محروم گشت از فضل رب

আমরা আল্লাহর কাছেই আদবের তাওফীক প্রার্থনা করি,
কারণ বেয়াদব আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকে।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, মানুষের মাঝে যে একটি খতম প্রচলিত আছে, যাতে পড়া হয়, ‘ইয়া শাইখ আবদুল কাদির, শাইআন লিল্লাহ!’[124] অর্থাৎ হে শাইখ আবদুল কাদের, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু

---

[124] ১২৪. অধিকাংশ ফুকাহা ও মুহাক্কিক সূফীগণ এই ওয়াযীফা নাজায়িয হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের বহু প্রবন্ধ ও ফাতাওয়া রয়েছে। এখানে কেবল বহুগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আবদুল হাই লাখনভী (১৩০৪ হিজরী) কর্তৃক লিখিত একটি ফাতওয়া উল্লেখ করছি, যাতে তিনি এই ওয়াযীফা রদ করেছেন। তিনি বলেন–

এই ওয়াযীফা থেকে বিরত থাকা অনেক কারণেই জরুরি। প্রথমত, এই ওয়াযীফার মধ্যে ‘শাইআন লিল্লাহ’ শব্দ রয়েছে, অথচ কতক ফকীহ এই শব্দ বললে কাফের হয়ে যাবে বলে মত দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এই ওয়াযীফার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে মৃত ব্যক্তিকে ডাকা হয়। অথচ শরীয়তে এটা প্রমাণিত নয় যে, ওলীরা দূর থেকে ডাক শুনতে সক্ষম। এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, মৃতরা যিয়ারতকারীদের সালাম শুনতে পায়। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হাযির-নাজির এবং প্রতিমুহূর্তে সকল গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয় জানে, সে শিরক করল।

শাইখ আবদুল কাদের জীলানি রহ. যদিও উম্মতে মুহাম্মাদির একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন এবং অনেক শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে এই কথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি দূর-দূরান্তের ডাক ও সাহায্যপ্রার্থনা শুনতে পেতেন এবং তাদের সাহায্য করতে পারতেন। তিনি প্রতিমুহূর্তে তাঁর মুরীদদের অবস্থা জানতেন এবং তাদের ডাক শুনতেন– এমন বিশ্বাস রাখা শিরক। –মাজমূউ ফাতাওয়া আবদুল হাই লাখনভী, ১/২৬৪

তাদের মধ্যে কতক আবার কিছু শর্ত ও তাবীলের মাধ্যমে এর অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে এটা গ্রহণ করবে, সে যা বলছে তা যেন বুঝতে পারে এবং তার উদ্দেশ্য যেন কেবল শাইখের রূহানিয়াত থেকে উপকার লাভ করা হয়। অথচ ইসলামী শরীয়ত শিরকের চেয়ে অনেক ছোট ছোট =

= পাপের রাস্তা বন্ধের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। তাহলে শিরকের রাস্তা বন্ধ করার ব্যাপারে কতটা গুরুত্বারোপ করা উচিত, যার চেয়ে বড় কোনও পাপ হতে পারে না? আমার মোটেই বুঝে আসে না যে, তাদের এমন জিনিসের আশ্রয় নিতে হলো কেন, অথচ আল্লাহ তাআলা সকল নিকটবর্তীর চেয়ে অধিক নিকটবর্তী এবং সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু? তিনিই বলছেন–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ

আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল,) আমি নিকটবর্তী, আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই যখন সে আমাকে ডাকে।

তিনি আরও বলেন–

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ

কে তিনি, যিনি কোনও নিরুপায় যখন তাকে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দেন ও তার কষ্ট দূর করে দেন?

এমনকি খোদ শাইখ আবদুল কাদের জীলানি তার ছেলে আবদুল ওয়াহ্হাবকে যে অসিয়ত করেছেন তাতে আছে– নিজের সকল প্রয়োজনকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর এবং তাঁর কাছেই সেগুলো কামনা কর। তিনি ছাড়া আর কারও প্রতি আস্থা রেখ না এবং অন্য কারও ওপর ভরসা করো না। তাওহীদকে আঁকড়ে ধর! তাওহীদকে আঁকড়ে ধর! তাওহীদকে আঁকড়ে ধর! মাজালিসুল ফাতহির রব্বানী, পৃ. ৬৬৫। 'ফুতুহুল গাইব' ও 'আল-ফাতহুর রব্বানী' গ্রন্থদ্বয়ে তার বয়ানসমূহ এ জাতীয় অসিয়ত এবং গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থনার ব্যাপারে ধমকি ও হুঁশিয়ারিতে ভরপুর, যেমন কিছু উক্তি পূর্বে গত হয়েছে।

এ বিষয়ে শাহ গোলাম আলী দেহলভী নকশবন্দী (১১৫৬-১২৪০ হিজরী) রহ.-এর একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে, যা তার মাজালিস সমগ্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরবী ১৩তম শতাব্দির একজন তাসাওউফের ইমাম ও অবিসংবাদিত বুযুর্গ ছিলেন। মাজালিস সমগ্রের সংকলক শাইখ আবদুর রউফ মুজাদ্দেদী তার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– একবার আমি বললাম– ইয়া শাইখ আবদুল কাদের জীলানি, শাইআন লিল্লাহ, তখন গায়বী একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, যা আমার কানে এনমভাবে বেজে উঠল যে, আমার কোনও সন্দেহ থাকল না, বলা হল– বল, ইয়া আরহামার রাহিমীন, শাইআন লিল্লাহ! (দুরুরুল মাআরিফ, পৃ. ৫৪)। –নদভী

দান করুন– এই শব্দ পরিহার করা উচিত। হ্যাঁ, যদি এরূপ বলে– হে আল্লাহ! আপনি আবদুল কাদের জীলানির উসিলায় দান করুন, তাহলে ঠিক আছে।[১২৫]

মোটকথা এমন কথা মুখে উচ্চারণ করবে না, যা থেকে শিরক বা আল্লাহর শানে বেয়াদবির গন্ধ আসে। তাঁর শান তো অনেক উঁচু এবং তিনি এমন বাদশা যিনি বিন্দুমাত্র কারও পরোয়া করেন না। সামান্য কারণে পাকড়াও করা এবং সামান্য কারণে পুরস্কৃত করা একমাত্র তাঁরই আয়ত্তে।

আর এটা একেবারেই অনর্থক কথা যে, মুখে বেয়াদবিপূর্ণ শব্দ বলবে আর মনে মনে অন্যকিছু উদ্দেশ্য নেবে। এ জাতীয় ধাঁধা বলার অনেক জায়গা আছে। আল্লাহর সাথে এগুলো বলার কোনও প্রয়োজন নেই। কেউ বাদশা বা নিজের বাবার সাথে ঠাট্টা করে না এবং ধাঁধাপূর্ণ কথা বলে না। এগুলো বলার জন্য তো বন্ধু-বান্ধবরা আছে।

নামের মধ্যে তাওহীদের নিদর্শন ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহপ্রদান এবং অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত কথার ব্যাপারে সতর্কীকরণ

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান'।[১২৬]

---

[১২৫] অর্থাৎ যাদের নিকট আম্বিয়া ও সালেহীনদের উসিলা দিয়ে দুআ করা জায়িয তাদের মতে। –নদভী

[১২৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৩২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৪৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৭২৮। –অনুবাদক

আবদুল্লাহ মানে আল্লাহর বান্দা এবং আবদুর রহমান মানে রহমানের বান্দা। সুতরাং আবদুল কুদ্দুস, আবদুল জলীল, আবদুল খালেক, খোদাবখশ, হেবাতুল্লাহ, আতাউল্লাহ[১২৭] ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, যেসব নাম আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়, বিশেষত আল্লাহর এমন নামের প্রতি সম্বন্ধ, যে নাম অন্য কারও জন্য বলা হয় না, এমন সব নামই এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

- সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে,

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ، سَمِعَهُمْ يَكْنُوْنَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟»

হযরত শুরাইহ ইবনে হানী তার পিতা হানী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন তার গোত্রের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন যে, তারা তাকে আবুল হাকাম উপনামে ডাকছে। এটা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাই একমাত্র হাকাম (বিচারক), (সকল বিষয়ে) ন্যায়বিচার করা একমাত্র তাঁরই আয়ত্তে, তাহলে তোমাকে কেন আবুল হাকাম উপনামে ডাকা হয়?[১২৮]

---

[১২৭] এখানে লেখক কয়েকটি হিন্দুস্তানী নাম উল্লেখ করেছেন, যেগুলোকে আমি আরবীতে অনুবাদ করে দিয়েছি। এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সব নাম, যেগুলোকে আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে, বিশেষত ওই সকল আসমায়ে হুসনার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে, যেগুলোকে গাইরুল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হয় না। —নদভী

[১২৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫৫; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৫৩৮৭; আল-আদবুল মুফরাদ বুখারী, হাদীস ৮১১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৪। —অনুবাদক

অর্থাৎ সকল মামলা চুকানো এবং সকল ঝগড়া মিটানো একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাজ, যা তিনি আখেরাতে করবেন। সেখানে তিনি পূর্বাপর দ্বীনি ও দুনিয়াবি সকল ঝগড়া মিটিয়ে দেবেন। কোনও মাখলুক এটা করতে সক্ষম নয়।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, যে শব্দ কেবল আল্লাহর সাথে মানায় এবং তাঁর মাঝেই পাওয়া যায়, এমন শব্দ অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। যেমন– বাদশাদের বাদশা বা শাহানশাহ, বিশ্বজগতের মালিক, যা চান করেন, কারও পরোয়া করেন না, সবচেয়ে বড় দাতা, সবচেয়ে বড় ধনী ইত্যাদি।[১২৯]

---

১২৯. ইতিহাসে বিভিন্ন রাজা-বাদশা ও আমীর-উমারাদের ব্যাপারে কবি, সভাসদ ও চাটুকার শ্রেণির এমন অনেক অতিশয়োক্তি বিবৃত হয়েছে, শরীয়ত যেগুলোকে নাজায়িয বলে এবং সুস্থ রুচিবোধ যেগুলোকে ঘৃণা করে। কখনো কখনো এসব বাদশা নিজেরাই নিজেদের জন্য এমনসব উপাধি ধারণ করেছে, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা, আল্লাহর সামনে তাদের দুঃসাহসিকতা এবং ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব নিয়ে তাদের দম্ভ-অহমিকা প্রকাশ পায়।

ইতিহাসের পাতায় আযদুদ দাওলা বিন রুকনুদ দাওলা দাইলামী (৩৭২ হিজরী)-এর একটি পঙক্তি বর্ণিত আছে, যা এই ধরনের ছ্যাবলামি ও নির্লজ্জতার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। সেই পঙক্তিটি হলো (অর্থ)–

أَنَا عَضُدُ الدَّوْلَةِ وَابْنُ رُكْنِهَا • مَلِكُ الْأَمْلَاكِ غَلَّابُ الْقَدَرِ.

আমি রাষ্ট্রের বাহু এবং এর কর্ণধারের পুত্র,
আমি সকল বাদশাদের বাদশা এবং
তাকদীরের উপর প্রভাব বিস্তারকারী!

আর পীর-মাশাইখ ও বুযুর্গদের ভক্ত-মুরীদরা তাদের জন্য যেসব উপাধি ও বিশেষণ আরোপ করেছে, তা আরও মারাত্মক ও তিক্ত।

তবে দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম সব যুগেই এসব সীমালঙ্ঘনকারী চাটুকারদের সমালোচনা ও নিন্দা করে আসছেন। এ ব্যাপারে সুলতানুল উলামা শাইখুল ইসলাম ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামের একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন। তা হলো, আল-মালিকুস সালিহের আমলে বাগদাদের খলীফা ইন্তেকাল করলে তিনি একটি শোকসভার আয়োজন করেন, যাতে বড় বড় আলেম-উলামা,=

- মুসনাদে আবু ইয়া'লা মাওসিলীতে বর্ণিত আছে,

عَنِ الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ مِنْ أُمِّهَا، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، قُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»

হযরত তুফাইল হযরত আয়শা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'তোমরা বলো না– মা শা আল্লাহ ওয়া শা আ মুহাম্মাদ (আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ যা চান!), বরং বল– মা শা আল্লাহ ওয়াহদাহু (একমাত্র আল্লাহ যা চান)।[১৩০]

= কারী সাহেব ও কবিদের দাওয়াত দেওয়া হয়। সেখানে খলীফার শোকে এক কবি আবৃত্তি করে–

مَاتَ مَنْ كَانَ بَعْضُ أَجْنَادِهِ الْمَوْ ● تُ وَمَنْ كَانَ يَخْشَاهُ الْقَضَاءُ

'মৃত্যুবরণ করেছেন এমন ব্যক্তি
যার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মৃত্যুও শামিল ছিল,
মৃত্যুবরণ করেছেন এমন ব্যক্তি
খোদ মৃত্যু (বা তাকদীর) যাকে ভয় পেত!'

এই পঙক্তি শুনে শাইখ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম সাথে সাথে আপত্তি জানালেন এবং ওই কবিকে বন্দি করে শায়েস্তা করার নির্দেশ দিলেন। শাস্তির পরেও সে দীর্ঘকাল বন্দি ছিল। অবশেষে আমীর-উমারা ও বিশিষ্টজনদের সুপারিশে তাকে তাওবা করিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তাকদীরকে কটাক্ষ করে বলা পূর্বের কবিতার কাফ্ফারাস্বরূপ সে আল্লাহর স্তুতিসংবলিত একটি কাব্য রচনা করে! (আল-ইবদা' ফী মাযাররিল ইবতিদা', পৃ. ১২৫)। –নদভী

[১৩০] মুসনাদে আবু ইয়া'লা মাওসিলী, হাদীস ৪৬৫৫। হাদীসটির রাবিগণ নির্ভরযোগ্য (মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ১১৯০১; ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ বূসীরী, হদীস ৪৮৪৪/৮)। হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে অনেক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন– শাইখ শুআইবের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত মুসনাদে আহমাদ, ২০৬৯৪ নং হাদীসের তাখরীজ।

লেখক এখানে হাদীসটি শরহুস সুন্নাহর উদ্ধৃতিতে হযরত হুযাইফার সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শরহুস সুন্নাহয় হাদীসটি সনদ ছাড়া রয়েছে। তাছাড়া =

অর্থাৎ যেসব বিষয় একমাত্র আল্লাহর সাথে খাস; অন্য মাখলুকের তাতে কোনও সম্পৃক্ততা নেই, সেসব বিষয়ে আল্লাহর সাথে কোনও মাখলুককে মেলাবে না, সে যত বড়ই হোক না কেন এবং যত নৈকট্য ধন্যই হোক না কেন। যেমন– এভাবে বলবে না যে, আল্লাহ ও রাসূল চাইলে অমুক কাজটি হবে। কেননা জগতের সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলা চাইলে হয়, রাসূলের চাওয়ার দ্বারা কিছুই হয় না।

অনুরূপভাবে কেউ জিজ্ঞাসা করল, অমুকের মনে কী আছে? অমুকের বিয়ে কবে হবে? বা অমুক গাছে কতগুলো পাতা আছে? কিংবা আকাশে কতগুলো তারা আছে? তখন এগুলোর উত্তরে বলবে না যে, আল্লাহ ও রাসূলই জানেন। কেননা গায়েবের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন, রাসূল জানেন না।

হ্যাঁ, দ্বীনি কোনও বিষয়ে এভাবে বলতে অসুবিধা নেই যে, এটা আল্লাহ ও রাসূলই জানেন, বা অমুক বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম এমন। কারণ দ্বীনের সকল বিষয় আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাতিয়েছেন এবং সকল বান্দাকে স্বীয় রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়া শিরক

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ.

হযরত সাআদ ইবনে উবাইদা রাযি. বলেন– একবার হযরত ইবনে উমর রাযি. এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, কা'বার কসম,

---

= উল্লিখিত শব্দ শরহুস সুন্নাহয় যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে হযরত হুযাইফা বা অন্য কারও নাম নেই। হযরত হুযাইফার সূত্রে আছে কিছুটা ভিন্ন শব্দে। দেখুন- শরহুস সুন্নাহ বাগাভী, হাদীস ৮৮৯১; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীস ৪৩১। –অনুবাদক

এমন না! তখন ইবনে উমর বললেন– গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়া যাবে না, কারণ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করল সে কুফরী করল, অথবা বলেছেন– সে শিরক করল।[১৩১]

- সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِيْ، وَلَا بِآبَائِكُمْ»

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা দেব-দেবী ও নিজেদের বাপ-দাদাদের নামে কসম খেয়ো না।[১৩২]

- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيْرُ فِيْ رَكْبٍ، يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَقَالَ: «أَلَا! إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন– একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর ইবনুল খাত্তাবকে একটি কাফেলায় চলমান অবস্থায় দেখলেন যে, তিনি তার পিতার নামে কসম খাচ্ছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম খেতে নিষেধ করছেন। কারও কসম খেতে হলে সে যেন আল্লাহর নামে কসম খায়, অথবা চুপ থাকে।[১৩৩]

---

[১৩১] জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫৩৫; সুনানে আবু দুউদ, হাদীস ৩২৫১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৫৩৭৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪৩৫৮। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। –অনুবাদক

[১৩২] সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৪৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৬২৪।
–অনুবাদক

[১৩৩] সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৪৬। –অনুবাদক

- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ مِنكُمْ، فَقَالَ فِيْ حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزّٰى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ»

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কসম খেতে গিয়ে বলে, লাত্-উয্যার কসম, তাহলে সে যেন পড়ে নেয়– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ![১৩৪]

আরবের লোকেরা জাহিলী যুগে দেব-দেবীর নামে কসম খেত। সুতরাং মুসলমান হওয়ার পরেও পুরনো অভ্যাস অনুযায়ী যদি কারও মুখ দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম বের হয়ে যায়, তাহলে সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নেবে।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছুর কসম খাওয়া যাবে না। ভুলে মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে তাওবা করতে হবে। আর মুশরিকদের মাঝে যাদের নামে কসম খাওয়ার প্রচলন আছে, তাদের নামে কসম খাওয়ার দ্বারা ঈমানের মধ্যে ত্রুটি যুক্ত হয়।

গাইরুল্লাহর জন্য মানত করা এবং যেখানে কোনও দেবতা বা জাহিলী যুগের মেলা বসত এমন স্থানে পশু জবাই করা জায়িয নয়

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে,

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

---

[১৩৪] সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১০৭, ৬৩০১, ৬৬৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৪৭।
–অনুবাদক

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوْا: لَا، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوْا: لَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ»

হযরত সাবিত ইবনে দ্বহ্হাক রাযি. বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি মানত করল যে, বুওয়ানা নামক স্থানে সে একটি উট জবাই করবে। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি জানাল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওই জায়গায় কি জাহিলীযুগের কোনও প্রতিমা ছিল, যার পূজা করা হত? লোকেরা জবাব দিল, না। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে কি জাহিলী সমাজের কোনও উৎসব হত? লোকেরা উত্তর দিল যে, না। তখন তিনি বললেন– তাহলে তুমি তোমার মানত পূরণ কর। কারণ আল্লাহর নাফরমানি হয় এমন মানত পূরণ করা যাবে না।[১৩৫]

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য মানত মানা গুনাহ, তাই এমন মানত পূরণ করা যাবে না। এই হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য মানত মানা যাবে না। আর মেনে থাকলে তা পূরণ করা যাবে না। কারণ গাইরুল্লাহর জন্য মানত মানাই একটি স্বতন্ত্র গুনাহ। তারপর আবার তার উপর স্থির থাকা ও পূরণ করা আরও বড় গুনাহ।

অনুরূপভাবে এটাও বোঝা গেল যে, যেসব জায়গায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে প্রাণী উৎসর্গ করা হয়, বা পূজা করা হয় কিংবা সেখানে একত্র হয়ে কোনও ধরনের শিরক করা হয়, এমন জায়গায় আল্লাহর নামে উৎসর্গিত প্রাণীও নিয়ে যাবে না এবং ভালো-মন্দ

---

[১৩৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৩১৩। হাদীসটির সনদ সহীহ। দেখুন– আল-মুহার্রার, ইবনে আবদিল হাদী, হাদীস ৭৭২; আল-বাদরুল মুনীর, কিতাবুন নাযার-হাদীস ১৯; আত-তালখীসুল হাবীর, হাদীস ২০৭০। –অনুবাদক

কোনও নিয়তেই সেখানে অংশগ্রহণ করবে না।[১৩৬] কারণ মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা একটি স্বতন্ত্র মন্দ কাজ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাযীমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির নিষেধাজ্ঞা

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، فَجَاءَ بَعِيْرٌ، فَسَجَدَ لَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: «اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوْا أَخَاكُمْ».

হযরত আয়শা রাযি. বর্ণনা করেন– একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মুহাজির ও আনসারিদের মাঝে ছিলেন। হঠাৎ একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করল। তখন সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে পশুরা এবং বৃক্ষরাজি সিজদা করে। তাহলে তো আমাদের জন্য আপনাকে সিজদা করা আরও বেশি জরুরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর।[১৩৭]

---

[১৩৬] সুতরাং স্পষ্ট হলো যে, বর্তমানে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় উদারতার নামে এবং 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' জাতীয় ভণ্ডামিমার্কা শ্লোগানে প্রতারিত হয়ে যেসব মূর্খ মুসলিমরা হিন্দুদের পূজা-পার্বণ, পহেলা বৈশাখ এবং খ্রিষ্টানদের বড়দিন ইত্যাদি উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের এই কাজটি খুবই আপত্তিকর, নিন্দনীয় ও গর্হিত। –অনুবাদক

[১৩৭] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৪৪৭১। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, হাদীস ৭৬৫৪, ১৪১৬৭। –অনুবাদক

'তোমাদের ভাইকে সম্মান কর'-এর ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী রহ. 'মিরকাত' (৬/২৭৭) গ্রন্থে লেখেন– অর্থাৎ তোমরা তার শান অনুযায়ী তাকে সম্মান কর, অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে এবং প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ =

= আনুগত্যমিশ্রিত শ্রদ্ধা দিয়ে। এতে ইশারা আছে সূরা আলে-ইমরানের ৭৯ নং আয়াতের প্রতি–

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

'কোনও মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে তা সত্ত্বেও মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। এর পরিবর্তে (সে তো এটাই বলবে যে,) তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও'।

অনুরূপভাবে সূরা মায়িদার ১১৭ নং আয়াতের প্রতি–

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِيْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ '

'আপনি আমাকে যে বিষয়ের আদেশ করেছিলেন তা ছাড়া অন্য কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক'।

আর থাকল উটের সিজদা করা, তো সেটা একটা অলৌকিক বিষয়, যা আল্লাহর নির্দেশে ঘটেছে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনও হস্তক্ষেপ নেই। আর উটটি সিজদা করতে বাধ্য হয়েছে কারণ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আদমকে সিজদা করার জন্য।

আল্লামা ত্বীবি রহ. বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয় প্রকাশার্থে এ কথা বলেছেন। অর্থাৎ তোমরা তাকে সম্মান কর যিনি তোমাদের মতই মানুষ এবং তোমাদের পিতা আদমেরই সন্তান। তোমরা তাকে সম্মান করবে কারণ আল্লাহ তাআলা তাকে মনোনিত করে সম্মানিত করেছেন এবং তার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন, যেমন কুরআনে বলেছেন–

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ

বলে দাও, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, (তবে) আমার প্রতি ওহী আসে।

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ 'লামাআত' (পৃ. ২৮৩)-এ বলেন– 'তোমাদের ভাই' বলে আসলে তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো বিনয় প্রকাশ করা এবং এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, তিনি তাদেরই মত হওয়ার কারণে তাকে সিজদা করা ও তার ইবাদত করা জায়িয নয়। –নদভী

অর্থাৎ সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। যিনি বড় বুযুর্গ তিনি বড় ভাই, সুতরাং তাকে বড় ভাইসুলভ সম্মান করবে। কিন্তু সকলেরই মালিক আল্লাহ তাআলা। সুতরাং ইবাদত একমাত্র তাঁরই করতে হবে।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, নবী-ওলী, ইমাম ও ইমামের ছাহেবযাদা এবং পীর-শহীদ, মোটকথা, আল্লাহর যত নৈকট্যশীল বান্দা আছে তারা সকলেই মানুষ, অক্ষম বান্দা এবং আমাদের ভাই।[১৩৮] তবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বড় বানিয়েছেন, তাই তারা বড় ভাই এবং আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আমরা তাদের চেয়ে ছোট, তাই আমাদের কর্তব্য হলো তাদেরকে মানবসুলভ সম্মান করা, প্রভুসুলভ নয়।

অনুরূপভাবে এটাও জানা গেল যে, কতক বুযুর্গকে কোনও গাছ বা কোনও প্রাণী সম্মান করে। ফলে দেখা যায়– কোনও দরগাহে সিংহ চলে আসে, কোনওটায় হাতি চলে আসে আবার কোথাও বাঘ উপস্থিত হয়ে যায়।[১৩৯] কিন্তু এগুলোর কোনওটিকে মানুষের জন্য দলীল বানানো উচিত নয়। বরং মানুষ তো বুযুর্গদের তেমনই সম্মান করবে যেমন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শরীয়তে যতটুকু জায়িয করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ কোনও মাযারে অবস্থান করার জন্য শরীয়তে বলা হয়নি, সুতরাং এটা কিছুতেই করা যাবে না। এখন কোনও মাযারে যদি কোনও বাঘ রাত-দিন অবস্থান করে তাহলে এটাকে দলীল বানানো যাবে না। কারণ মানুষের জন্য তো জানোয়ারের সাথে প্রতিযোগিতা করা কাম্য নয়।

---

[১৩৮] অর্থাৎ সত্তাগত ও সৃষ্টিগত দিক থেকে। আর আমাদের সকলের প্রতিপালক একজন এবং সকলের পিতাও একজনই। 'তোমরা সকলেই আদম থেকে সৃষ্ট আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট'। –নদভী

[১৩৯] এর হেকমত ও রহস্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। –নদভী

- সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে,

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُوْلُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ أَتَيْتُ الْحِيْرَةَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِيْ أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوْا».

হযরত কায়েস ইবনে সাআদ রাযি. বলেন– আমি একবার আল-হিরা নামক শহরে আসলাম। এসে দেখলাম, তারা তাদের রাজাকে সিজদা করছে। তখন আমি মনে মনে বললাম, তাহলে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। অতঃপর যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন বললাম– আমি আল-হিরা নামক স্থানে গিয়ে দেখেছি যে, তারা তাদের রাজাকে সিজদা করছে, তাহলে আপনি তো আমাদের সিজদা পাওয়ার বেশি উপযুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন– চিন্তা কর তো, তুমি যদি আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম কর, তাহলে কি তাতে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন– তাহলে (এখনও) করো না।[১৪০]

অর্থাৎ আমিও একদিন মরে মাটির সাথে মিশে যাব, তাহলে আবার সিজদার উপযুক্ত হলাম কীভাবে? সিজদাহ তো কেবল সেই পবিত্র সত্তারই প্রাপ্য যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, সিজদাহ না কোনও জীবিতকে করা যাবে, আর না কোনও মৃতকে; না কোনও মাযারকে করা যাবে আর না কোনও দরবার-আস্তানাকে। কারণ যে জীবিত আছে সে একদিন মরে যাবে। আর যে মরে গেছে সে একদিন জীবিত ছিল এবং মনুষ্যত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। এরপর মরে তো আর খোদা হয়ে যায়নি, বান্দাই রয়ে গেছে।

---

[১৪০] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২১৪০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ২৭৬৩। হাকেম রহ. হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন। –অনুবাদক

শিরকের সন্দেহযুক্ত শব্দাবলির ব্যাপারে সতর্কীকরণ

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ، كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ»

وزاد في رواية: «وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ، فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ: اَللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'তোমাদের কেউ যেন (দাস-দাসীর ক্ষেত্রে) এভাবে না বলে– আমার বান্দা, আমার বান্দী। তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল নারীরাই আল্লাহর বান্দী। অনুরূপভাবে কোনও গোলাম যেন তার মনিবকে না বলে– আমার মাওলা। কারণ তোমাদের সকলের মাওলা হলেন আল্লাহ তাআলা'।[১৪১]

অর্থাৎ মনিব তার দাস ও দাসীকে বান্দা ও বান্দী বলবে না। অনুরূপভাবে গোলাম তার মনিবকে মাওলা বা মালিক বলবে না। কেননা মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। বাকি সবাই তারই বান্দা। কেউ কারও বান্দা নয় এবং কেউ কারও মালিক নয়।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি কারও বাস্তবেই গোলাম সেও যেন কথাবার্তায় এভাবে না বলে যে, সে অমুকের বান্দা আর অমুক তার মালিক।

তাহলে মিথ্যামিথ্যা কারও বান্দা হওয়া, আবদুন নবী (নবীর বান্দা), বান্দায়ে আলী, বান্দায়ে হুযুর, বান্দায়ে খাস, পীরের ইবাদতকারী ইত্যাদি[১৪২] উপাধি ধারণ করা এবং যে কাউকে 'প্রভুদের প্রভু', 'মহাদাতা' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা একেবারেই অনর্থক

---

[১৪১] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৪৯। –অনুবাদক

[১৪২] এগুলো উর্দূ-ফারসীর বহুল প্রচলিত কিছু বাচন। যেমন– 'শাহেদ পুরস্ত', 'আশনা পুরস্ত', 'পীর পুরস্ত', 'হুসুন পুরস্ত', 'কাফেরে ইশক' ইত্যাদি।

এবং চরম বেয়াদবি। সামান্য বিষয় দেখা দিলেই কাউকে বলা যে, তুমি আমাদের জান-মালের মালিক, আমরা তোমারই কর্তৃত্বে, তুমি যা চাও কর– এগুলো একেবারেই অবাস্তব-মিথ্যা এবং শিরকি কথা।

খ্রিষ্টানরা তাদের নবীর প্রশংসায় যে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে, তার অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ»

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। নিশ্চয়ই আমি তাঁর বান্দা, সুতরাং তোমরা বলবে– আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।[১৪৩]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাকে যে বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তা বর্ণনা কর। আর রাসূল বলার দ্বারা তার পুরোটা এসে যায়। কারণ মানুষের জন্য রাসূল হওয়ার চেয়ে বড় কোনও মর্যাদা নেই। সকল মর্যাদা এরচেয়ে নিচে।

তবে মানুষ রাসূল হওয়ার পরেও মানুষই থাকে এবং আল্লাহর বান্দা হওয়াই তার জন্য গৌরবের বস্তু। তার মধ্যে খোদায়ী কোনও শান-মর্যাদা চলে আসে না এবং আল্লাহর সত্তার সাথে সে মিশে যায় না[১৪৪]। সুতরাং এ জাতীয় কোনও কথা বলা যাবে না। কারণ

---

[১৪৩] সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৪৪৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬২৩৯।

–অনুবাদক

[১৪৪] পানিতে সিরকা মিশে যাওয়ার মত, যেমনটি খ্রিষ্টানদের কোনও কোনও দল বিশ্বাস করে। –নদভী

খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে এসব কথা বলেই কাফের হয়ে গেছে এবং আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

এসব কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করেছেন যে, তোমরা খ্রিষ্টানদের পথে চলো না এবং নিজেদের নবীর প্রশংসায় সীমা অতিক্রম করো না, পাছে খ্রিষ্টানদের মত বিতাড়িত হয়ে যাও।

কিন্তু আফসোস! এই উম্মতের বেয়াদব লোকেরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছে এবং আখেরে তারাও খ্রিষ্টানদের অনুরূপ কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। কারণ খ্রিষ্টানরাও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে এ কথাই বলত যে, তার বেশে মূলত আল্লাহ তাআলা অবতরণ করেছেন, তাই তিনি একদিক থেকে মানুষ, অপরদিক থেকে খোদা! হুবহু এই কথা কতক লোক আমাদের নবীর শানেও বলে ফেলেছে!

যেমন একজন বলেছে– 'প্রতি শতাব্দিতে আল্লাহ তাআলা আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন। সর্বশেষ আরবের এক ব্যক্তির আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং জগতের বাদশা হয়েছেন'। আরেকজন বলেছে– 'তাকদীর এক উটনীতে দুই আরোহীকে চড়িয়েছে, একজন ক্ষণস্থায়ী সালমা[১৪৫], অপরজন চিরস্থায়ী লায়লা'[১৪৬]!

বরং কতক মিথ্যুক-প্রতারক তো এই কথাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুড়ে দিয়েছে যে, তিনি নাকি বলেছেন– 'আমি মীমবিহীন আহমাদ' (অর্থাৎ আমি খোদা। নাউযু বিল্লাহ)!

অনুরূপভাবে একটি বড় আরবী লেখা তৈরি করে সেখানে অনেক আজগুবি কথাবার্তা যুক্ত করেছে, অতঃপর তার নাম দিয়েছে 'খুতবাতুল ইফতিখার' এবং সেটাকে হযরত আলীর প্রতি সম্বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা সকল মিথ্যুককে অপদস্থ করুন!

---

১৪৫. উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কারণ তিনি ক্ষণস্থায়ী। –নদভী

১৪৬. উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার অনন্ত-অসীম সত্তা। –নদভী

যেমনিভাবে খ্রিষ্টানরা বলে– দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্মকাণ্ড হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আয়ত্তে। যে তাকে মানবে এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার কোনও ইবাদতের প্রয়োজন নেই, কোনও গুনাহ তার ক্ষতি করবে না এবং হালাল-হারাম বেছে চলা তার জন্য জরুরি নয়। সে তো খোদার নামে উৎসর্গিত স্বাধীন বলদের ন্যায় হয়ে যায়, যা ইচ্ছা করতে পারে! আখেরাতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সুপারিশ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। ঠিক তেমনি জাহেল-মূর্খ মুসলমানরা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে! বরং একধাপ এগিয়ে ইমাম, আওলিয়া বরং সকল পীর-মাশায়েখের ব্যাপারেও এরূপ আকীদা পোষণ করে। আল্লাহ হেদায়াত করুন!

- সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: اِنْطَلَقْتُ فِيْ وَفْدِ بَنِيْ عَامِرٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: «قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখ্‌খীর রাযি. বলেন– আমি আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। গিয়ে আমরা বললাম, আপনি আমাদের সরদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– সরদার একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আমরা বললাম, আপনি আমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান এবং সবচেয়ে বড় সামর্থ্যবান। তিনি বললেন– তোমরা এ জাতীয় কথা বলতে পার বা এরচেয়েও কিছু কম বল, আর শয়তান যেন তোমাদেরকে স্পর্ধাযুক্ত বানিয়ে না দেয়।[১৪৭]

---

[১৪৭] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০৬; আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী, হাদীস ২১১; সুনানে কুবরা নাসাঈ, হাদীস ১০০০৪। হাদীসটির সনদ সহীহ।

অর্থাৎ কোনও বুযুর্গের ব্যাপারে মুখ সামলে কথা বলবে এবং মানবসুলভ যতটুকু প্রশংসা করা যায় ততটুকুই করবে এবং সেটাও সংক্ষেপে করবে। এ ক্ষেত্রে লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় মুখ ছুটাবে না, পাছে আল্লাহর শানে বেয়াদবি করে বস।

হাদীসে বর্ণিত সরদার শব্দের দুই অর্থ হতে পারে। এক হলো, তিনি স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী মালিক হবেন, কারও অধীনস্থ হবেন না। তিনি যা চাবেন করবেন। যেমন বাদশারা সাধারণত করে থাকে। তো এটা কেবল আল্লাহর শান। এই অর্থে তিনি ছাড়া আর কেউ সরদার নয়।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, অধীনস্থই বটে, কিন্তু অন্যান্য অধীনস্থ প্রজাদের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। ফলে আসল সরদারের নির্দেশ প্রথমে তার নিকট আসে, পরে তার মুখ থেকে অন্যরা জানতে পারে। যেমন প্রত্যেক গোত্রের নেতা এবং প্রতি গ্রামের জমিদার।

এই অর্থে প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের সরদার; প্রত্যেক ইমাম তার সময়ের লোকদের সরদার; প্রত্যেক মুজতাহিদ তার অনুসারীদের সরদার; প্রত্যেক বুযুর্গ তার মুরীদদের সরদার; প্রত্যেক আলেম তার শাগরেদদের সরদার। কারণ এসকল বড়রা প্রথমে নিজেরা আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, অতঃপর নিজেদের ছোটদের শিক্ষা দেয়।

সুতরাং এই দৃষ্টিতে আমাদের নবী সারাবিশ্বের সরদার। কারণ আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা সবচেয়ে বেশি এবং আল্লাহর হুকুম-আহকামের উপর তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত। বাকি সকল লোক আল্লাহর হেদায়াত লাভের জন্য তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। তাই এই অর্থে তাঁকে সারাজাহানের সরদার বলতে কোনও অসুবিধা নেই, বরং এটাকে জরুরি মনে করতে হবে। পক্ষান্তরে প্রথম অর্থে তাঁকে একটি পিঁপড়ের সরদারও মনে করা যাবে না। কারণ তিনি স্বাধীনভাবে একটি পিঁপড়ের ওপরও কর্তৃত্ব করতে সক্ষম নন।

নেককারদের ছবি-মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قُلْتُ: اِشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ»، وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ».

হযরত আয়শা রাযি. বলেন যে, তিনি একটি ছবিওয়ালা বালিশ ক্রয় করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব লক্ষ করলাম। তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাওবা করছি। আমি কী অন্যায় করেছি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন– এই বালিশ কেন, কোথা থেকে? আমি বললাম, আপনার জন্য আমি ক্রয় করেছি, যেন আপনি এতে টেক লাগিয়ে বসতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এসব ছবি অঙ্কনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ তাতে প্রাণ দাও। তিনি আরও বললেন– যে ঘরে এসব ছবি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।[১৪৮]

অর্থাৎ অধিকাংশ মুশরিকরা মূর্তিদের পূজা করে, এ কারণে ফেরেশতাদের মধ্যে ছবির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং নবীরাও

---

[১৪৮] সহীহ বুখারী, হাদীস ২১০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১০৭। –অনুবাদক

এগুলোকে ঘৃণা করেন। আর এগুলো যারা তৈরি করে তাদের শাস্তি হবে, কারণ তারা মূর্তিপূজায় ইন্ধন যোগায়।

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, যেসব মূর্খ লোকেরা নবী, ইমাম, ওলী বা নিজেদের পীরদের ছবির তাযীম করে এবং বরকতের জন্য নিজের কাছে রেখে দেয়, তারা সম্পূর্ণ গোমরাহ এবং শিরকে নিমজ্জিত। নবী এবং ফেরেশগণ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

তাই ছবিকে নাপাক মনে করে ঘর থেরে সরিয়ে ফেলবে, তাহলে নবীও খুশি হবেন এবং ফেরেশতারাও ওই ঘরে আগমন করবেন, তখন তাদের পদচারণা দ্বারা ঘরে বরকত ছড়িয়ে পড়বে।

- মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامُ
ضَلَالَةٍ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِيْنَ»

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– কিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি যাদের হবে তারা হলো, যে ব্যক্তি কোনও নবীর হাতে নিহত হয়েছে বা সে কোনও নবীকে হত্যা করেছে এবং পথভ্রষ্টকারী ইমাম (বা শাসক) ও (প্রাণীর) ছবি অঙ্কনকারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোনও অঙ্কনকারী।[১৪৯]

অর্থাৎ ছবি তৈরিকারীও ওই সকল বড় বড় গুনাহগারদের মধ্যে শামিল। এ থেকে ছবি অঙ্কন করার গুনাহের ভয়াবহতা বোঝা যায়। ইয়াযীদ এবং শিমার তো কোনও নবীকে হত্যা করেনি, বরং নবীর নাতিকে হত্যা করেছে, যিনি নবীর স্থলাভিষিক্ত ও যুগের ইমাম ছিলেন।

---

[১৪৯] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৮৬৮; শরহু মুশকিলিল আসার তহাবী, হাদীস ৬। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস ৯১৯৮)। লেখক হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে বাইহাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাইহাকীর সনদটি যঈফ হওয়ায় আমরা এই সূত্রটি উল্লেখ করেছি। –অনুবাদক

পক্ষান্তরে ছবিঅঙ্কনকারীর গুনাহ খোদ নবীকে হত্যাকারীর ন্যায়। সুতরাং সে ইয়াযীদ এবং শিমার থেকেও নিকৃষ্ট।

- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ، فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ شَعِيْرَةً».

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন– ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে? আচ্ছা, তাহলে তারা একটি কণা সৃষ্টি করুক, কিংবা পারলে একটি শস্যদানা বা একটিমাত্র জবের দানা সৃষ্টি করুক।[১৫০]

অর্থাৎ ছবি তৈরিকারী কেমন যেন ভেতরে ভেতরে খোদা হওয়ার দাবি করে। তাই যেসব জিনিস আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন সেগুলোর অনুরূপ বানাতে চায়। এমন ব্যক্তি বড়ই বেয়াদব এবং তার দাবি একেবারেই মিথ্যা। কারণ সে তো আসলে একটি শস্যদানা সৃষ্টিরও ক্ষমতা রাখে না। কেবল দেখে দেখে নকল করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন তারচেয়ে বাড়িয়ে বললে তিনি কষ্ট পান

সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّيْ لَا أُرِيْدُ أَنْ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِيَ الَّتِيْ أَنْزَلَنِيْهَا اللهُ تَعَالٰى، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ».

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তাআলা আমাকে

---

[১৫০] সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১১১। –অনুবাদক

যে মর্যাদায় আসীন করেছেন, আমি চাইনা তোমরা আমাকে তারচেয়ে উপরে উঠাও। আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।[১৫১]

অর্থাৎ অন্যান্য নেতারা তাদের প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করলে যেমন খুশি হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেমন খুশি হতেন না। কারণ মানুষের দ্বীনদারী নিয়ে ওই সকল নেতাদের কোনও চিন্তা ছিল না, চাই ঠিক থাকুক বা বিগড়ে যাক। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো স্বীয় উম্মতের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল মুরুব্বি ছিলেন এবং তাদের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। রাত-দিন শুধু উম্মতের দ্বীনদারী নিয়েই চিন্তা করতেন।

সুতরাং যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর উম্মত তাঁকে অনেক মুহাব্বত করে এবং তাঁর প্রতি তারা খুবই কৃতজ্ঞ আর মানুষের স্বভাব হলো, যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে তখন তার প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করে। আর যে কেউ নবীদের প্রশংসায় সীমা ছাড়িয়ে যাবে, সে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করে বসবে। আর তাতে তার দ্বীনদারী বরবাদ হয়ে যাবে এবং প্রকৃত অর্থে নবীর দুশমনে পরিণত হবে।

সুতরাং এসব বিবেচনা করে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, অতিশয়োক্তি আমি একদম পছন্দ করি না। আমার নাম মুহাম্মাদ, আল্লাহ-খালেক-রায্যাক ইত্যাদি কিছু নই। সকলের মত আমিও পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছি। বান্দা হওয়াটাই আমার নিকট সবচেয়ে বেশি গৌরবের। তবে অন্য সকল মানুষ থেকে আমার শ্রেষ্ঠত্ব হলো, আমি আল্লাহর হুকুম-আহকামের ব্যাপারে অবগত, আর অন্য সবাই এ বিষয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তাদেরকে আমার কাছ থেকেই আল্লাহর দ্বীন শিখতে হবে।

---

[১৫১] সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১০০০৬, ১০০০৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৫৫১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬২৪০। —অনুবাদক

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের এই দয়ালু ও মহানুভব নবীর প্রতি হাজারো দরূদ-সালাম প্রেরণ করুন এবং তিনি আমাদের মত মূর্খদের দ্বীন শেখানোর জন্য যে চেষ্টা-পরিশ্রম করেছেন, তার যথাযথ প্রতিদান দান করুন।

আমরা তো অত্যন্ত দুর্বল ও অক্ষম বান্দা। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে যেমন শিরক ও তাওহীদের অর্থ বুঝিয়েছেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্ম শিক্ষা দিয়েছেন এবং মুশরিকদের কাতার থেকে বের করে খাঁটি তাওহীদের অধিকারী মুসলমান বানিয়েছেন, ঠিক তেমনি বিদআত ও সুন্নাতের অর্থ ভালোভাবে বোঝান, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' -এর মর্ম শিক্ষা দিন এবং বিদআতী ও ভ্রান্ত মতাদর্শের লোকদের কাতার থেকে বের করে সুন্নাতের অনুসারী খাঁটি সুন্নী বানিয়ে দিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

* * *

اِنْتَهَيْتُ مِنَ التَّرْجَمَةِ الْبَنْجَالِيَّةِ وَالتَّخْرِيْجِ الْمُوْجَزِ صَبَاحَ الْخَمِيْسِ، غُرَّةَ ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ ١٤٤١هـ. اللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

محمد عباس حنيف كان الله له

١١ محرم الحرام ١٤٤٢ هـ

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি কিতাব

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন
দাওয়াত ও তাবলীগ
আলোকিত জীবনের পথ
মহীয়সী না
বায়তুল্লাহ্‌র পথে

মাকতাবাতুল আশরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.com
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.com